

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি ।

# ভক্তের জয়ে

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী কর্তৃক

বিরচিত ।

কলিকাতা ।

৪০নং মহেন্দ্রনাথ গোস্বামীর লেন,  
শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমন্দির হইতে  
গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত ।

বঙ্গাব্দ ১৩১৬ সাল, ১১ই চৈত্র ।

মূল্য ১, এক টাকা মাত্র ।

---

কলিকাতা,  
৪৭নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, বাণী প্রেসে,  
শ্রীআশুতোষ চক্রবর্তীর দ্বারা মুদ্রিত।

---



ভক্তের জয়

সূচী-পত্র ।

বিষয় ।	পৃষ্ঠা ।
গণপতি ভট্ট	১
বলরামদাসের রথযাত্রা	১৭
দীনবন্ধু দাস	৪০
বিশ্বম্ভর দাস	৬১
বন্ধু মহাস্তি	৮১
রথু অরক্ষিত	১০৭
দামোদর দাস	১৪৮
কৃষ্ণপ্রিয়ার পত্র	১৬৪

কৃষ্ণের সমতা হইতে বড় ভক্তপদ ।

আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত প্রেমানন্দ ॥

আত্মা হৈতে কৃষ্ণ 'ভক্ত বড়' করি মানি ।

তাহাতে বহুত শাস্ত্রবচন প্রমাণে ॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত



Cooch Behar জয় ।

গণপতি ভট্ট ।

( শ্রীশ্রীজগন্নাথের গণেশবেশ । )

উত্তরখণ্ডে কর্ণাটদেশ । কর্ণাটের কাণিয়ারি-গ্রামে এক সৰ্ব্বসদৃশ-সম্পন্ন বেদ-বিদ্যা-বিশারদ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বাস করিতেন । তাঁহার নাম—গণপতি ভট্ট । ভট্টের ভগবানে অচলা ভক্তি । বিষয়চিন্তা ছাড়িয়া ভগবানের চিন্তাতেই তিনি অহরহ নিমগ্ন থাকিতেন । সদাই ভাবিতেন,—এ বিশ্বসংসারের সকল সামগ্রীই,—পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ সকল প্রাণীই,—সূর-অসূর-দিক্‌পালাদি সকলেই বারংবার যাতায়াত করিতে থাকে, কেবল একমাত্র পরব্রহ্ম জগন্নাথই নিত্য সত্য, তাঁহার যাওয়াও নাই, আর আসাও নাই । তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াই সকল প্রাণী সংসারের পারে গমন করে । তাঁহার রূপা ব্যতিরেকে জীবের উদ্ধারের আর অন্য উপায়ই নাই । কিন্তু হইলে কি হয়, তাঁহাকে পাই কোথায় ? সকল শাস্ত্রেই তো দেখি,—তিনি আমাদের ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর । তাঁহাকে না পাইলে, তাঁহার রূপা অধিকার না করিতে পারিলেও তো মুক্তিলাভের অন্য উপায়

নাই। এখন করি কি ? আচ্ছা, ভগবানে যখন সকলই আছে, তখন তাঁহাতে এটা আছে ওটা নাই,—এ কথাও তো বলিতে পারা যায় না। অণুও তিনি বৃহৎও তিনি, সপ্তও তিনি নিগুণও তিনি, সূক্ষ্মও তিনি স্থূলও তিনি। তিনি নন—এমন কিছুই যখন এ সংসারে থাকিতে পারে না, তবে তাঁহার—ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপের মত ইন্দ্রিয় ও মনের গোচর স্থূল রূপও তো থাকিবার কথা। আহা, তাঁহার সেই স্থূল রূপ কোথায়—কোন পুণ্যধামে বিরাজ করিতেছেন ? যদি তত্ত্ব পাই, তখনই তাঁহার উদ্দেশে প্রধাবিত হই ; এই চক্ষুচক্ষে তাঁহাকে দর্শন করি, আর তাঁহাকে দর্শন করিয়া যাতনাপথ অতিক্রমপূর্বক পরমানন্দময় মোক্ষপদের অধিকারী হই। আহা, সেই শুভদিন আমার কবে হইবে ?

ভট্ট ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া কেবল এই কথাই ভাবেন, আর তন্ন তন্ন করিয়া, সকল শাস্ত্র অনুসন্ধান করেন। এইরূপে কিছু দিন যায় ; ভট্টের উৎকর্ষার আর সীমা পরিসীমা নাই। শাস্ত্র দেখিতেদেখিতে একদিন তিনি ব্রহ্মপুরাণে দেখিলেন,—

“স্থূলস্বরূপ গোটি ধরি ।      ব্রহ্ম অচ্ছত্তি নীলগিরি ॥  
 তাহু দেখন্তি যেউঁ মানে ।      মুকত ছয়ন্তি দর্শনে ॥  
 ন গমে যম দরশন ।      সকল শাস্ত্রে এ প্রমাণ ॥”

পরমব্রহ্ম স্থূলস্বরূপ ধারণ করিয়া শ্রীনীলাচলে বিরাজ করিতেছেন। যে ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিবে, সে-ই মুক্তিপদের অধিকারী হইবে। তাহাকে আর যমভবনে যাইতে হইবে না।

ব্রহ্মপুরাণের এই বচন পাইয়া ব্রাহ্মণ আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন । ইষ্টদেবতার গায় বচনটি হৃদয়পদ্মে ধারণ করিলেন । তখন তিনি নির্বেদনভরে, প্রাণে প্রাণে বলিয়া উঠিলেন,—

“বোইলা—ধিক এ সংসার ।	ধিক এ মায়াজাল মোর ॥
ধিক মো দারা স্নাত ধন ।	ধিক অটই এ জীবন ॥
এ মর্ত্যপুরে দেহ ধরি ।	ব্রহ্ম অচ্ছন্তি নীলাগিরি ॥
আজর যাএ মুঁ ন জানে ।	ভ্রমুঁ অচ্ছই অকারণে ॥
যাহাকু নয়নে দেখিলে ।	জীব নিস্তার হোএ ভলে ॥
যে গতাগত পথ জানি ।	রহে ব্রহ্মর দেহে নগি ॥
সে ব্রহ্ম ছাড়ি মুঢ়পণে ।	মুঁ এখি খিবি কি কারণে ॥
দারা তনয় ধন যেতে ।	কে ঘিব মোহর জঙ্গতে ॥
দেহে সমর্থ থিলা যাএ ।	সবুরি বন্ধু হোই থাএ ॥
বয়স হেব যেরে শেষ ।	দারা-পুত্রকু হোএ বিষ ॥
আউ কে অটই কাহার ।	দেহ ত নোতে আপনার ॥”

এ সংসারে ধিক্, আমার এ মায়াজালে ধিক্, স্ত্রী-পুত্র-ধনে ধিক্, এ জীবনে ধিক্ । সেই ব্রহ্মবস্তু এই মর্ত্যপুরেই দেহ ধারণ পূর্বক নীলাচলে অবস্থান করিতেছেন, আজিও আমি জানিতে না পারিয়া অকারণে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি । আহা ! যে ব্রহ্মকে নয়নে দেখিলে জীব অনারাসে নিস্তার লাভ করে এবং গতান্বয়ের পথ অবগত হইয়া সেই ব্রহ্মের দেহেই দীন হইয়া যায় ; হায় ! আমি অতিশয় মুঢ়, তাই তাঁহাকে ছাড়িয়া এতদিন এই অসার সংসারে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি । কিন্তু আর এ সংসারে থাকি কেন ? স্ত্রীপুত্র ধন কেহই ত আমার সঙ্গে যাইবে না ? যত দিন দেহ সবল, ততদিনই এই দেহ সকলের বন্ধু হইয়া

থাকে । বয়স শেষ হইয়া আসিলে এই দেহই আবার স্ত্রী-পুত্রেরও 'বিষ' বলিয়া বোধ হয় । অহো ! এই দেহই যখন আপনার নহে ; তখন আর অণু কে-ই বা কাহার ?

ভট্ট মনেমনে এইরূপ আলোচনা করিয়া অবধারণ করিলেন, আমি অবিলম্বে নীলাচলে গমন করিব এবং সেই ব্রহ্ম দর্শন করিয়া অনায়াসে মুল্লিপদ লাভ করিব । তিনি আর কালবিলম্ব করিলেন না,—সংসারের মায়া-মমতা ও দেহের আশা-ভরসা বিসর্জন দিয়া বাটার বাহির হইয়া পড়িলেন । তাঁহার সঙ্গের সখ্য রহিল কেবল সেই ব্রহ্মের অনৃতময় নাম আর ব্রহ্মপুরাণ ।

দিনের পর দিন—মাসের পর মাস চলিয়া গেল, কিন্তু ভট্টের পথ-চলার আর বিরাম নাই । ভিক্ষা ছাটিল হো ভিক্ষার, না হয় কেবল পত্র ফল মূল—যে দিন যাহা জোটে, ভট্টের তাহাই আহার ; কিছু না জুটিলে উপবাস করিতেও তিনি কাতর নহেন । পানীয় জলেরও তাঁহার বিচার নাই ; তা নদীরই হউক, কূপেরই হউক কিংবা পুষ্করিণীরই হউক । পিপাসার সময় একটু পাঁচলেই হইল । এক ব্রহ্ম-চিন্তা ছাড়া ভট্টের আর অণু চিন্তাও নাই—ভয়ও নাই । ভয় থাকিবেই বা কিসে ?—

“ব্রহ্মেরে লাগি অছি লয় । তেহু তা কিচ্ছি নাহি ভয় ॥”

এইরূপে বহুদিন বহুদেশ অতিক্রম করিয়া ভট্ট আঠারনালায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন । আঠারনালা নীলাচলের অতি নিকটেই । এই স্থানের নাহায়াও অতীব বিচিত্র । তথায় প্রবেশ নাহই জীব বনদণ্ডকে জয় করিয়া থাকে । ভট্ট এই পবিত্র স্থান



দর্শন করিয়া চম্ব্চক্ষু সার্থক করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে আনন্দের উপর আনন্দের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। তিনি তথায় নিশ্চল আসনে বসিয়া একাগ্রচিত্তে ব্রহ্মচিন্তা করিতে লাগিলেন।

গণপতি ভট্ট ব্রহ্মচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া বসিয়াই আছেন। থাকিতেথাকিতে দেখিলেন,—কতকগুলি লোক তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। তাঁহাদের সকলেরই হস্তে ‘অবটা’ (অন্ন মহাপ্রসাদ)। সকলেই আনন্দে আত্মহারা। কেহ বা উচ্চস্বরে গান গাহিতেছেন, কেহ বা নানা রঙ্গের অবতারণা করিতেছেন; আবার কেহ বা হাসিয়াহাসিয়া অপরের গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছেন। সংসারের শোক-তাপ জ্বালাবস্তুণা যেন তাঁহারা জানেন না।

সকলকেই সম্মুখে আনন্দে আনন্দিত দেখিয়া ভট্ট বিষয় সহকারে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—পথিকগণ! তোমাদের এত আনন্দ কিসের? তোমরা কোথা হইতে আসিতেছ? কি লাভই বা পাইয়াছ? ভট্টের কথার উত্তরে পথিকগণ বলিলেন,—বিপ্রবর! আমরা নীলাচলে গিয়াছিলাম, তথায় পাঁচ দিন থাকিয়া প্রাণ ভরিয়া ব্রহ্মদর্শন করিয়া শ্রদ্ধাপূত-হৃদয়ে আবার গৃহে ফিরিয়া চলিতেছি। এ সংসারে ইহা অপেক্ষা অধিক লাভ কি-ই বা হইতে পারে?

ভট্ট এই কথা শুনিয়া ক্ষণকাল স্তম্ভীভূত হইয়া রহিলেন। পরে সংশয়-সমুবেলিত-হৃদয়ে তাঁহাদিগকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—পথিকগণ! বল বল, সত্য করিয়া বল,

তোমরা যথার্থই কি সেই ব্রহ্মকে দর্শন করিয়াছ ? পথিকগণ “হাঁ সত্যসত্যই দর্শন করিয়াছি” বলিয়া চলিয়া গেলেন। তখন এক অভিনব চিন্তায় ভট্টের হৃদয় তোলপাড় করিয়া তুলিল। তিনি মনেমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—পথিকগণ বলিলেন,—এখানে ব্রহ্ম আছেন, আর তাঁহারা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া আসিয়াছেন ; এ সকল কথা নিশ্চয়ই মিথ্যা। কেন না, যাহার দর্শন লাভ করিলেই মুক্তি, সেই ব্রহ্মকে দেখিয়া ইহঁারা আবার ফিরিয়া আসিলেন কি প্রকারে ? ইহঁাদের তো ব্রহ্মশরীরে মিশিয়া যাইবারই কথা।

ভট্ট অশান্ত-হৃদয়ে বসিয়াবসিয়া দেখিতে লাগিলেন,—ঐরূপ আনন্দ-উল্লাস করিতেকরিতে দলেদলে যাত্রিকদল অবিশ্রান্ত গমন করিতেছেন। জিজ্ঞাসা করিলে সকলেরই মুখে ঐ একই কথা। পথিকগণের কথা শুনিয়া কিন্তু ভট্টের সংশয় অপনীত হইল না, বরং বাড়িয়াই যাইতে লাগিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ব্রহ্মপুরাণ খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন, পুরাণ-বচন দেখিতে তো ভুল করি নাই। দেখিলেন,—না, আমার তো দেখিবার ভুল হয় নাই, পুরাণে যে স্পষ্টই লেখা রহিয়াছে—“ব্রহ্ম অচ্ছত্তি নীলগিরি।”

ব্রাহ্মণ পুরাণবচন বারংবার পড়িলেন, কিন্তু মনের সংশয় মিটিল না। তিনি তখন ভাবিতে লাগিলেন, এখন করি কি ? লোকের কথা বিশ্বাস করিতে হইলে বলিতে হয়, ব্রহ্ম নীলগিরিতে নাই ; কেন না ব্রহ্ম দর্শন করিয়া তো ফিরিবার কথা নহে ;

বরং ব্রহ্মের সঙ্গে মিশিয়া যাইবারই কথা । আবার এ দিকে পুরাণেও দেখিতেছি—ব্রহ্ম নীলাচলে আছেন । এখন কাহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করি ? এক দিকে সাক্ষাৎ লোকের চোখে দেখা কথা, আর এক দিকে পুরাণের পুঁথিগত কথা । কোন্ কথাই বা বেশী বিশ্বাসযোগ্য ? এইরূপ কত কি ভাবিতে-ভাবিতে ব্রহ্মের বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল । তিনি “ন যমৌ ন তম্ভৌ” হইয়া রহিলেন । মনেমনে স্থির করিলেন,—গৃহদ্বার যখন একবার ছাড়িয়া আসিয়াছি, তখন সেখানে আর ফিরিয়া যাইব না ; নীলাচলে যখন ব্রহ্ম নাই, তখন সেখানেও আর যাইবার দরকার নাই । দুইদিকের কোন দিকেই শান্তি নাই । ব্রহ্মরূপ সাক্ষাৎকার তো আর এ পাপ জীবনে ঘটিল না ; তখন এ জীবন না রাখাই ভাল । দুই দিকের কোন দিকেই যাইয়া কাজ নাই, কালকূট বিষ ভক্ষণ করিয়া এইখানেই জীবন বিসর্জন দিই । আত্মহত্যা—আত্মহত্যা,—আত্মহত্যাও যে মহাপাপ ! তাহাই বা করি কি প্রকারে ?

ভট্ট এইরূপ ভাবিতেছেন । ভাবগ্রাহী ভগবান্ তাহা জানিতে পারিলেন । জানিবেন না-ই বা কেন ?—

“সে সৰ্ব্ব-অন্তর্যামী হরি । সকল ঘটে চ্ছন্তি পুরি ॥  
ভগত-মন যার ঘর । তাহাকু কিস অগোচর ॥”

একেতো ভগবান্ সকলেরই অন্তর্যামী, সকল ঘটেই তিনি পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছেন, তাহার উপর আবার ভক্তের মনই তাঁহার নিত্য নিকেতন, গণপতি ভট্ট সেই ভগবানের অরুণট

ভক্ত, স্মৃতির ভট্টের হৃদয়ের কথা কি কখনও ভগবানের অগোচর থাকিতে পারে ?

ভক্তাধীন ভগবান্ আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না । তিনি তৎক্ষণাৎ এক ব্রাহ্মণ-স্বরূপ ধারণ করিয়া ভট্টের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ব্রহ্মাণ্ডের নাথ হাসিতেহাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বিপ্রবর ! আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন ? এখানে বসিয়াই বা আছেন কেন ? কোন্ স্থানেই বা যাইবেন মনে করিতেছেন ? আপনাকে এত দুঃখিতই বা দেখিতেছি কেন ? আমাকে অকপটে তাহা বলুন ।

সেই অপূৰ্ণ ব্রাহ্মণমূর্তি দেখিয়া, তাঁহার অমৃতমধুর কথা শুনিয়া ভট্টের অশান্ত হৃদয় যেন কতকটা শান্ত হইল । তিনি বিনয়-সহকারে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—মহাশয় ! ব্রহ্মণ্ড রূপ ধারণপূৰ্ব্বক নীলাচলে অবস্থান করিতেছেন, আর তাঁহাকে দেখিলেই জীবের দুঃখ দূর হইয়া যায়, ব্রহ্মপুত্রাণে এই কথা পাঠ করিয়া আমি ব্রহ্মদর্শন-মানসে নীলাচলে যাইতে ছিলাম । কিন্তু এখানে আসিয়া অবগত হইলাম যে, ব্রহ্ম নীলাচলে নাই । তাই বিষণ্ণ-মনে এখানে বসিয়া রহিয়াছি ।

বিপ্ররূপী ভগবান্ ভট্টকে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্ম যে নীলাচলে নাই, ইহা আপনি কি প্রকারে জানিলেন ? ভট্ট বলিলেন,—বিপ্রচূড়ানি ! ব্রহ্মদর্শন করিলে তো ব্রহ্মের শরীরে সকলেই লয় প্রাপ্ত হয়, অথচ আমি এখানে বসিয়া প্রত্যক্ষই দেখিতেছি, শতশত লোক ব্রহ্মদর্শন করিয়া আবার ফিরিয়া

আসিতেছে, তবে কেমন করিয়া বলি যে, ব্রহ্ম নীলাচলে  
রহিয়াছেন ।

ভট্টের এই কথা শুনিয়া ভগবান্ মৃদুগন্দ হাস্ত করিতেকরিতে  
তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—

“বোইলে—শুন বিপ্রবর । তো মনে সংশয় না কর ॥  
ব্রহ্ম ন থিবা এ প্রমাণ । তাহা কহিবা এবে শুন ॥  
যে আশ্বা কল্পতরু হরি । যে যাহা মনে বাঞ্ছা করি ॥  
তাঁহাকু সেই ফল দেই । তেহুটি বাঞ্ছানিধি সেই ॥  
যেবন প্রাণী এথে আসি । দর্শন করে ব্রহ্মরূপি ॥  
কল্পমা করি তাঁক মনে । লেউটি-ধিবাকু মদনে ॥  
তাঁহাকু যদ্যপি রখিলে । কি বাঞ্ছানিধি বোলাইলে ॥  
এহু যে যাহা কল্পি থাই । তাঁহাকু সেই ফল দেই ॥  
পেশস্তি প্রভু মহামেরু । তেহুটি বাঞ্ছাকল্পতরু ॥  
যেবন লোক মুক্তি অর্থে । নিশ্চয় আসিথিবে এথে ॥  
তাঁহাকু মুক্তিপথ দেবে । তু বিপ্র বেগে বাঅ এবে ॥  
মনে তু সংশয় ন কর । ব্রহ্মকু দর্শন কর ॥”

কল্পবৃক্ষের কাছে যে যাহা চায়, সে তাঁহাই পাইরা থাকে ।  
পরমাত্মা শ্রীহরিও বাঞ্ছাকল্পতরু । তাঁহার কাছেও যে যাহা চায়,  
সে তাঁহাই লাভ করে । যে সকল লোক সেই পরব্রহ্ম শ্রীহরিকে  
দর্শন করিয়া পুনরায় গৃহে ফিরিয়া যাইতে চাছে, তিনি সেই  
সকল লোককে আটকাইয়া রাখেন না ; গৃহেই ফিরাইয়া দেন ।  
যে গৃহে ফিরিয়া যাইতে চায়, তাঁহাকে আটকাইয়া রাখিলে তিনি  
আর বাঞ্ছানিধি বলাইবেন কি প্রকারে ? আবার যদি কেহ  
তাঁহার কাছে দৃঢ়চিত্তে মুক্তিরই প্রার্থনা করে, তিনি তাঁহাকে  
মুক্তিই প্রদান করিয়া থাকেন ; তাঁহাকে আর ঘরে ফিরাইয়া  
দেন না । বিপ্রবর ! তুমি আর বিলম্ব করিও না, মনের সংশয়

দূর করিয়া নীলগিরিতে গমন কর,—ব্রহ্ম দর্শন করিয়া কৃতার্থ হও ।

এই কথা বলিয়া বিপ্ররূপী ভগবান্ অস্তর্হিত হইলেন । ভট্টও পরমানন্দে নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন । মনের আবেগে অল্প সময়ের মধ্যেই সিংহদ্বারে পতিতপাবনদেবের সন্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।

দৈবযোগে সেই দিনই স্নানযাত্রা । তাই দেবাদিদেব জগন্নাথ দেউল পরিত্যাগ করিয়া স্নানমণ্ডপে শুভ বিজয় করিয়াছেন । তাঁহার চারিদিকে সেবকবৃন্দ অশেষ তীর্থের জল লইয়া জয়জয়-ধ্বনি করিতেছেন । দেব-স্নান দেখিবার নিমিত্ত দেবগণও স্বর্গ হইতে আসিয়া মানুষের সহিত মিলিয়া মিশিয়া মহানহোৎসব করিতেছেন । হরিহরধ্বনিতে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে । আনন্দের আর সীমা-পরিদীমা নাই । এমন সময় গণপতি ভট্ট স্নানমণ্ডপে যাইয়া উপস্থিত ।

ভট্ট দাক্ষিণ্য দর্শন করিলেন । একবার নয় দুইবার নয়, শতশতবার তিনি দাক্ষিণ্যকে নিরীক্ষণ করিলেন । কিন্তু তাঁহার প্রাণের অভাব মিটিল না । তিনি মাথার হাত দিয়া একটি সামান্য প্রণামও করিলেন না ; যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই ফিরিয়া চলিলেন । ভট্টের দুঃখ রাখিবার আর স্থান নাই ।

ভট্টের হৃদয়ের ভাব,—গণেশই একমাত্র ব্রহ্ম । যাঁহার গজানন নাই, তিনি কখনও ব্রহ্মই হইতে পারেন না । ইঁহারও যখন গজবদন নাই, তখন ইনিও ব্রহ্ম নহেন ।

ভক্ত ভট্টের হৃদয়ের কথা ভক্তহৃদিহারী শ্রীহরির জানিতে বড় বিলম্ব হইল না। অন্তর্যামী নারায়ণ তখনই অলক্ষ্যভাবে জগনোহনে গমন করিলেন। পূর্ব দিবস প্রভুর পার্শ্বে রাত্রি-জাগরণ-প্রযুক্ত 'মুদিরথ' \* পণ্ডা তথায় নিদ্রালস হইয়া শয়ন করিয়া ছিলেন। তাঁহার কাছে গিয়া স্বপ্নমার্গে আদেশ করিলেন— মুদিরথ! উত্তরদেশ হইতে আমার এক পরম ভক্ত পরমানন্দে আমাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার ধারণা—যাঁহার গজানন নাই, তিনি কখনও ব্রহ্ম নহেন। আমার গজমুখ না দেখিয়া ভক্ত মহাত্ম্যে বিমুখ হইয়া চলিয়া যাইতেছে, তুমি শীঘ্র যাও, যাইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আইস। গিয়া এই কথা বল যে, ওহে ঋষি! তুমি ফিরিয়া যাইতেছ কি নিমিত্ত? তুমি আমার সহিত আইস, নিশ্চয় নেত্র চাহিয়া দেখ দেখি, গজানন দেখিতে পাইবে এখন।

এই কথা বলিয়া অন্তর্যামী অন্তর্হিত হইলেন। মুদিরথও তাড়াতাড়ি উঠিয়া হরিনাম করিতেকরিতে গণপতি ভট্টের উদ্দেশে দৌড়ানৌড়ি গমন করিলেন। অচিরেই তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—

\* 'মুদিরথ'—শ্রীজগন্নাথের সেবক পণ্ডা বিশেষ। ইঁহারা পুরীরাজের প্রতিনিধিরূপে শ্রীজগন্নাথের সেবা করিয়া থাকেন। ৭ বৎসর হইতে ১২ বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত ইঁহাদের সেবার অধিকারকাল নিরূপিত। অনেক বলেন যে— "মুদ্রহস্ত" হইতে এই শব্দের উৎপত্তি। ইঁহারা অনেক সময় শ্রীপ্রভুর সম্মুখে মুদ্রিতহস্তে—জোড়হস্তে অবস্থান করেন।

“বোইলা—শুন বিপ্রগোটি । কিপা তু যাউচ্ছ লেউটি ॥  
 ব্রহ্মকু দরশন কর । বাঙ্গা সম্পূর্ণ হেউ তোৱ ॥  
 যে চতুর্বিধ-ফলদাতা । অশেষ জীবর করতা ॥  
 ভগতজন প্রাণবন্ধু । নাম করুণায়য় সিদ্ধু ॥  
 যে যাহা বাঙ্গা করে চিত্তে তাহাকু তাহা দেবা অর্থে ॥  
 বিজয় নীলাচল গিরি । শ্রীদাকুব্রহ্ম রূপ ধরি ॥  
 তাহাকু ছাড়ি মূঢ়পণে । লেউটি যাউ কি কারণে ॥

ব্রাহ্মণ ! তুমি কিরিয়া যাইতেছ কেন ? চল ব্রহ্ম দর্শন কর,  
 তোমার বাঙ্গা সম্পূর্ণ হউক । যিনি ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই  
 চতুর্বিধ ফল দান করেন, যিনি সমগ্র জীবের কর্তা, যিনি ভক্ত-  
 জনের প্রাণের বন্ধু, যাহার নাম করুণাসিদ্ধু, তিনি সকলের  
 বাঞ্ছিত ফল দিবার নিমিত্ত শ্রীদাকুব্রহ্মরূপ ধারণ করিয়া নীলাচলে  
 বিরাজ করিতেছেন । মূঢ়তা প্রযুক্ত তুমি তাহাকে ছাড়িয়া  
 অকারণে চলিয়া যাইতেছ কেন ?

মুদিরথের কথা শুনিয়া গণপতি ভট্ট অতিশয় ক্রোধভরে  
 কটু কথা কহিয়া কেলিলেন,—ওহে ! তুমি আর মিছা ভাঁড়াও  
 কেন ? এখানে ব্রহ্ম কোথায় ? যাহার গজবদন নাই, আমি  
 তাহাকে ব্রহ্মই বলি না । তুমি ফিরে যাও—ফিরে যাও, বৃথা  
 আমার পাছুপাছু আসিয়া আমাকে ফিরাইতে চেষ্টা করিতেছ  
 কেন ? আমি তোমার সহিত যাব না হে যাব না ।

ভট্টের কথা শুনিয়া মুদিরথ আবার বলিলেন,—বিপ্রবর !  
 তুমি তোমার মতিভ্রম ছাড় । এই,—এই দেখ, সাক্ষাৎ দাকু-  
 ব্রহ্ম শুভ বিজয় করিয়াছেন । তুমি আমার সহিত আসিয়া



একবার নিশ্চল নয়নে চাহিয়া দেখ দেখি, নিশ্চয়ই গজ্ঞানন দেখিতে পাইবে ।

মুদিরথের এই কথা শুনিয়া ভট্টের ক্রোধ অন্তর্হিত হইল । আনন্দভরে তাঁহার হৃদয় পরিপূরিত হইয়া উঠিল । তিনি মহানন্দে মুদিরথের সহিত ফিরিয়া চলিলেন । মুদিরথ তাঁহাকে দারুব্রহ্মের সম্মুখে লইয়া গিয়া বলিলেন,—ব্রাহ্মণ ! দেখ দেখি, একবার ভাল করিয়া—প্রাণ মন এক করিয়া নিশ্চল নয়নে দেখ দেখি, ইনিই তোমার সেই সর্বসম্বাপহারী গজবদনধারী শ্রীহরি কি না ?

মুদিরথের কথায় ভট্ট আপন চঞ্চল মন স্থির করিলেন । মন স্থির হইবামাত্রই তাঁহার সাস্বিক দিব্য জ্ঞানের উদয় হইল । তিনি তখন নিশ্চল দিব্য নয়নে দেখিলেন । কি দেখিলেন ? দেখিলেন,—

“দেখিলা প্রভু ভগবান । হোই অচ্ছস্তি গজ্ঞানন ॥  
লবি অচ্ছস্তি খোরহস্ত । শোভা দিশই একদন্ত ॥”

অহো ! প্রভু ভগবান্ গজ্ঞানন হইয়া আছেন, তাঁহার গুণ লক্ষ্যমান হইয়া দুলিতেছে, আর একটি দন্ত শোভা পাইতেছে ।

ভট্টের দেখা আর ফুরায় না । তিনি অনিমেঘ নয়নে তাঁহার প্রাণারাম গণপতি-মূর্তি দেখিতে লাগিলেন,—কেবল দেখিতেই লাগিলেন । দেখিতেদেখিতে ভট্ট আরও যাহা দেখিলেন, তাহা অতীব অপূর্ব ! ভট্ট আরও কি দেখিলেন ? দেখিলেন,—

“অদ্বুত বিশ্বরূপ ধরি । ভূতাকু ডাকুচ্ছস্তি হরি ॥”

অহো ! যিনি ইন্দ্রিয় মনের অগোচর, সেই সূতুলভ ভগ-  
বান্ অপরূপ বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া অমিয়মাথানো স্ববে ভক্ত  
ভট্টকে আপন সমীপে আহ্বান করিতেছেন,—আয় আয় ভট্ট !  
আমার কাছে আয় কাছে আয়, আহা বাছা, আমার জন্ত তুই  
কতই না ক্লেশ পাইয়াছিস্, কতই না বাতনা সহিয়াছিস্ ; আয়  
আয় বাছা ! আমার কাছে আয় কাছে আয়, আমার হৃদয়ের ধন !  
হৃদয়ে আয়, আয় আয় বাছা ! তোর অনন্ত দুঃখের অবসান  
হইয়া যাউক,—নিত্য নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে হৃদয় পরিপূর্ণ হউক ।

তখন ভট্ট করিলেন কি ?—

“তাহা গুণিন মহামতি । বোলে—নমস্তে গণপতি ॥

নমো নমস্তে গজানন । নমস্তে কপিলবদন ॥

নমস্তে দারুব্রহ্মবাণী । নমো নমস্তে বিশ্ববাসী ॥

তব দর্শনে দারুব্রহ্ম । টুটীলা মোর মতিভ্রম ॥

লভিলি পরম কারণ ।”

তিনি ভাবগদগদকণ্ঠে ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন ।  
বলিলেন—ওহে গণপতি তোমায় নমস্কার নমস্কার ; ওহে গজানন  
তোমায় নমস্কার নমস্কার ; ওহে কপিলবদন তোমায় নমস্কার  
নমস্কার ; ওহে দারুব্রহ্ম তোমায় নমস্কার নমস্কার ; ওহে বিশ্বরূপ  
তোমায় নমস্কার নমস্কার । দারুব্রহ্ম হে, তোমার দর্শনে আমার  
মতিভ্রম দূর হইয়া গেল । আমি এতদিনে পরমকারণ তোমাকে  
পাইয়া পূর্ণকাম হইলাম । দয়াময়, জানিতাম না যে, দীনহীন  
জীবে তোমার এত দয়া । জানিতাম না হরি, তুমি কল্পতরুর  
মত যে যাহা বাঞ্ছা করে, তাহাকে তাহাই অকাতরে বিতরণ

করিয়া থাক। জানিতাম না বিশ্বরূপ, সকল রূপই তোমাতে সতত বর্তমান ;—যে যে-রূপে তোমায় দেখিতে চায়, তুমি তাহাকে সেই রূপেই দর্শন দিয়া থাক। তুমি আজ দয়া করিয়া জানাইলে বলিয়াই তো জানিতে পারিলাম। নাথ ! তোমার তত্ত্ব তুমিই জান, আর যাহাকে দয়া করিয়া জানাও, সে-ই জানিতে পারে ; অস্ত্রে তো পারে না। তাই কাতরে প্রার্থনা করি,—দয়াময়, যতদিন তোমার এই স্নানযাত্রা মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে, ততদিনই তোমার ভক্তবৎসল-নামের সাক্ষিস্বরূপ—বাঞ্ছাকল্পতরু-নামের প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ এই গণেশ-বেশ অঙ্গীকার করিতে হইবে। নাথ ! যুগে যুগে তোমার এই অনুপম মহিমা উদ্‌ঘোষিত হইতে থাকুক।

ভক্তবৎসল ভগবান্ তখন সহাস্রবদনে ভট্টকে বলিলেন—  
“তথাস্তু”। ভট্টও গরজানন্দে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন, উষ্ঠিয়া অঞ্জলিবদ্ধ করযুগল মস্তকে ধারণ করিলেন, হৃদয়ে ব্রহ্মস্বরূপ ধ্যান করিতেকরিতে অচঞ্চলভাবে অবস্থান করিলেন। সকলে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন—ভট্টের দেহ হইতে দিবা জ্যোতি নিঃসৃত হইয়া বিহ্বাতের মত যাইয়া ব্রহ্মশরীরে মিশ্রিত হইয়া গেল,—ভট্টের প্রাণপাখীও দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া কোথায় উড়িয়া চলিয়া গেল। সকলে জয়জয়-নাদে দশদিক্ মুখরিত করিয়া তুলিল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আনন্দনয় হরিক্ষনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে আনন্দের বৃষ্টি আর তুলনা হয় না।

জয় ভক্তের জয়। জয় ভক্তবৎসল ভগবানের জয়। ভক্ত তুমি ধৃষ্ট। কেননা তুমি ভগবান্কে আপন অধীন করিতে

পার । আর ভগবান্ তুমিও ধন্য । কেন না তুমিও জাতি-কুল-  
বিদ্যা-সম্পদ প্রভৃতির অপেক্ষা না রাখিয়া ভক্ত মাত্রকেই আত্মসাৎ  
করিয়া থাক । তাই ব্রহ্মাদি-বন্দিত তুমি অষ্টাবধি শ্রীনীলাচল-  
ধামে স্নানযাত্রার দিন ভক্তপ্রার্থিত গণপতি-বেশ বা হস্তিবেশ  
অঙ্গীকার করিয়া থাক । প্রভু, তোমার জয় হউক—জয় হউক ।

কবি যথার্থই বলিয়াছেন—

“এণু সে সংসার মধ্যেন । প্রভুভকত বড় জন ॥  
ভক্তকু ন করিব সান । ভক্ত দ্বিতীয় ভগবান ॥”

এই সংসার মধ্যে ভগবানের ভক্তই বড় । ভক্তকে কেহ  
কখনও ছোট বলিয়া মনে করিও না । ভক্ত—ভগবানের অভিন্ন  
তনু—ভক্ত দ্বিতীয় ভগবান্ । ভগবন্ ! তোমার ভক্তের জয়  
হউক—জয় হউক ।

---

## বলরামদাসের রথযাত্রা

বলরাম দাসের নিবাস শ্রীপুরখোত্তম ধাম। তিনি মহাত্ম সোমনাথের শিষ্য। তত্ত্বমণ্ডলীতে তাঁহার বড়ই খ্যাতিপ্রতিপত্তি। ভিক্ষাই তাঁহার জীবিকা। ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভগবানে সমর্পণ করিয়া,—সেই নিবেদিত অন্ন ভোজনান্তে তিনি সপরিবারে পরমানন্দেই দিনযাপন করেন। কোন দুঃখ নাই—চিন্তা নাই। চিন্তার মধ্যে তিনি কেবল চিন্তামণির চরণ-চিন্তাই করিয়া থাকেন। সেই আনন্দেই তিনি সতত বিভোর। যদি কাহারও মুখে তিনি একবার ভগবানের নাম শুনিতে পান, তবে মনে করেন, যেন কোটি নিধি হস্তগত হইল। হরিকথা শ্রবণ—হরিকথা কীর্তন করিয়া, হরি-প্রেমে মজিয়া থাকিতেই তিনি প্রাণে-প্রাণে ভাসিবাসেন। সাধুসঙ্ঘের সঙ্গেই তাঁহার সর্বদা বসবাস। সকল জীবেই তাঁহার সমান দয়া। শ্রীনীলাচলনাথ দারুভক্ষ জগন্নাথের সেবা ব্যতীত তিনি আর কিছুই জানেন না, তাহাই তাঁহার জীবনব্রত। শুণ তে এত, কিন্তু পূর্কজন্মের কি-হে কর্মফল বলা যায় না, চন্দ্রে কলঙ্কের মত তাঁহার একটি মহান্ দোষও ছিল। তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় যখন-তখন বেষ্ঠাভবনে গমন করিতেন।

এইরূপে কিছুদিন যায়। আষাঢ় মাস, জগবন্ধুর গুণ্ডিচা-যাত্রা ( রথযাত্রা ) উপস্থিত। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা দেবীর

তিনখানি রথ প্রস্তুত । বলরাম 'তালধ্বজ' রথে, স্তম্ভদেবী 'বিজয়া' রথে এবং জগন্নাথ 'নন্দিঘোষ' রথে আরোহণ করিলেন । বিশ্বাসী সকলকেই কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত তিনজনে শ্রীশুভচিত্তা অভিমুখে শুভযাত্রা করিলেন । লক্ষলক্ষ লোক আনন্দ-কোলাহলে—জয়জয় হরিহরি রোলে চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিল । বিবিধ বাণের আরাব, সংকীর্ণনের উচ্চ-নিম্নাদ এবং সর্বোপরি নন্দিঘোষ-রথের গুরুগম্ভীর গর্জন সেই ধ্বনির সহিত মিশিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ করিয়া ফেলিল । দরনীতে বৃষ্টি আনন্দ আর ধরে না ।

এই আনন্দমহোৎসবে পুরীবাসী প্রায় সকলেই আসিয়া যোগদান করিয়াছেন । আসিতে পারেন নাই অতি অল্প লোকই । যাহারা আসিবার সৌভাগ্যে বঞ্চিত, বলরাম দাস তাঁহাদের মধ্যে একজন । তিনি তখন বেষ্টাগৃহে আন্দোল-প্রবোধে প্রবৃত্ত ; আজিকার এ মহোৎসবের কথা তাঁহার একটুও মনে নাই । হঠাৎ সেই আনন্দময় উচ্চ-ধ্বনিতে তাঁহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল । তখনই তিনি মাথায় হাত চাপড়াইয়া আপনাকে শতশত বিক্রার প্রদান করিতে লাগিলেন,—

“বোইলে—বিক্ মো জীবন । অজ্ঞানে বঞ্চিলি মুঁ দিন ॥

প্রভু মো রথে বিছে কলে । শোই মুঁ অছি বেষ্টাবুলে ॥”

হার হার ! আমার জীবনে বিক্, জীবনে বিক্ ! আমি অজ্ঞানে অন্ধ হইয়া দিনরাপন করিলাম । প্রভু জগন্নাথ রথযাত্রায় বাহির হইয়াছেন, আর আমি কিনা বেষ্টা সঙ্গে শয়ন করিয়া রহিয়াছি ? হার হার ! আমার জীবনে বিক্ ! জীবনে বিক্ !

সেই অপ্রাকৃত ভূমানন্দের প্রবল আকর্ষণের সমীপে পার্থিব ক্ষীণ ক্ষণিকানন্দ পরাভব স্বীকার করিল। বেষ্ঠার প্রতারণাময় প্রেমের ফাঁস আর বলরামকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। তিনি ধ্বনি শুনিয়াই উন্নতের মত উধাও হইয়া ছুটিলেন,—চক্ষুর পলক না পড়িতে-পড়িতে রথের অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আসিয়া দেখিলেন কি ? দেখিলেন,—তাঁহার প্রেমময় পরাণ-বাঁধুয়া রথোপরি বিরাজ করিতেছেন। দেখিয়া বলরাম আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অমনি তিনি এক লম্ফে নন্দিঘোষ রথের উপরে বাইয়া উঠিলেন। অঞ্জলিবদ্ধ করযুগল মাথার উপর রাখিলেন। নির্নিমেষ নয়নে আনন্দময়ের বদন হেরিতে থাকিলেন ; আর বিনাইয়া-বিনাইয়া কত কি বসিতে লাগিলেন।

জগন্নাথের সেবকবৃন্দ কিন্তু বলরামকে দেখিয়া ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন। কর্কশবরে বসিতে লাগিলেন,—

“গেও তো তামুলর গার ।	কুহুমে দেহ জরজর ॥
অতি কদর্যা তোর কায়ে ।	দিগুচ্ছি খণ্ড চিত্র প্রায়ে ॥
মান শউচ তোর নাহি ।	খিনু তু বেষ্ঠাঘরে শোই ॥
কিপাঁ তু চড়িলু রথর ।	ভগতপণ পোড়ু তোর ॥
কে তোতে ধোলে জ্ঞানবস্তু ।	দেখ হো প্রভু জগন্নাথ ॥
ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি যার পাদে ।	সেবা করন্তি অপ্রমাদে ॥
তাহাসু তোর ভয় নাহি ।	আসিছু গুচিবস্তু নোহি ॥”

আরে, তোর গালে পানের পিচ লাগিয়া রহিয়াছে। কুহুম-রাগে দেহ ভরিয়া গিয়াছে। তোর শরীর অতি অপবিত্র ; ঠিক যেন একখণ্ড ছবির মত দেখাইতেছে। তোর মান করা নাই,

শুকাচার নাই ; বেশার ঘরে তুই শুইয়াছিলি । আর সেই অবস্থায় তুই রথের উপর আসিয়া চড়িলি কি বোলে ? তোর ভক্তপণার মুখে আগুন, মুখে আগুন ;—তোর ভক্তপণা পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাউক । তোকে জ্ঞানবস্তুই বা বলে কে ? আহা প্রভু জগন্নাথ ;—ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি দেবগণ অতি সম্ভরণে সাবধানে যাঁহার চরণসেবা করিয়া থাকেন, তোর তাঁকে একটু ভয় নাই ; অশুচি অবস্থাতেই কিনা তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিস্ ?

এইরূপে সেবকগণ যাঁহার মনে যাহা আসিল, গালি দিতে-দিতে এবং গলাধাক্কার উপর গলাধাক্কা দিতে-দিতে বলরামকে রথের উপর হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন । ফেলিয়া দিয়াও সেবকগণের ক্রোধের বিরাম নাই, তখনও তাঁহারা অজস্রধারে বলরামের উপর তুর্কাক্য বর্ষণ করিতে লাগিলেন । শেষে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া দিলেন,—  
“যারে যা, তোর বাপের কাছে যা ; এই কথা তোর বাপের কাছে গিয়া বল ।”

সেবকবৃন্দের কাছে এইরূপে তিরস্কৃত, অপমানিত ও লাঞ্চিত হইয়া বলরাম মরমে মরিয়া গেলেন, দুঃখ-সস্তাপে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল । তিনি অভিমানভরে ভক্তের যিনি মাতা-পিতা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলই—সেই জগন্নাথের সম্মুখে যাইয়া উপস্থিত হইলেন । দূরে রহিয়াই একবার চাঁদবদন ভাল করিয়া দেখিলেন । অননি তাঁহার নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল । তিনি ভূমিতে অবলুষ্ঠিত হইয়া তাঁহার প্রাণবন্ধুর উদ্দেশে একটি



প্রণাম করিলেন । আবার উঠিয়া কপালে করযুগল স্থাপন করিয়া গদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—“ওহে চক্রপাণি ! তোমায় নমস্কার । ওহে জ্বলদবরণ পদ্মবদন ! তোমায় নমস্কার । ওহে মহাবাহু ! ভক্ত তোমায় যে সাজে সাজায়, তুমি সেই সাজেই সাজিয়া থাক, ভক্তের লজ্জা তুমিই নিবারণ করিয়া থাক, তাই তুমি ভক্তবৎসল, তোমায় নমস্কার । তোমার অপার মহিমা !—তুমি যুগল-করে শঙ্খ-চক্র ধারণ করিয়া ঐ যে নন্দিঘোষ রথে বিরাজ করিতেছ ; ঐ রথের উপর থাকিয়া থাকিয়াই তুমি তিন-পুরে বিরাজমান রহিয়াছ । তুমি পরিচ্ছিন্ন হইয়াও অপরিচ্ছিন্ন । তোমার তেজ তেজোরশি সূর্য্যকেও গঞ্জনা দিতেছে । তোমার শক্তিসামর্থ্যের তো কিছুই অভাব নাই । তবে তুমি স্বয়ং আমার সুওচ্ছেদন না করিয়া পরহস্তে দণ্ড দিলে কি নিমিত্ত ? ইহাতে তোমার ঘণই বা বাড়িয়া গেল কত ? আমার এতদিন ধারণা ছিল যে, আমার প্রতি তোমার অপার করুণা ; এইবার সেই করুণার পরিমাণ বেশ বুঝা গেল—বুঝা গেল !”

এই সকল কথা বলিতে-বলিতে অভিমানের প্রবল আবেগে বলরাম দাস তাঁহার প্রভুকে দুইটা কটুকথাও কহিয়া ফেলিলেন । বলিলেন,—“ওহে তুমি আমাকে তোমার সেবক হাথাইয়া দণ্ড দেবে বই কি—দেবে বই কি ! তুমি হ'লে নন্দঘোষের বেটা, আর আজ একবারে নন্দিঘোষ রথে চড়িয়া অমূল্য আসনে উপবেশন করিয়া আছ ; আমাদের মত অধম জন কি এখন আর তোমার মনে পড়িতে পারে ? ওহে তুমি আর আমাদের দিকে তাকাইয়া দেখিবে কেন—দেখিবে কেন ? আমি তোমায় প্রাণবন্ধু বলিয়াই জানিতাম,

তাই তোমার কাছে আসিয়াওছিলাম । তাই বলে কি এত দণ্ড দিতে হয় ? সে যাহা হউক, আজ তোমার উত্তমরূপেই চেনা গেল— চেনা গেল ।”

দুইটা কটুকথা বলিয়াও বলরাম ক্ষান্ত নহেন । তিনি তাঁহার প্রভুদত্ত দণ্ডের উপযুক্ত প্রতিদণ্ড বিধানে অগ্রসর হইলেন । প্রণয়-গর্বে স্মীত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—“আমি তোমার উত্তমরূপেই শিক্ষা দিতেছি । তোমার নাড়ী-নক্ষত্র সকলই তো আমি জানি । এইবার তোমার আক্লেম হইবে । এই আমি কিরিয়া চলিলাম ; দেখি তোমার রথের দড়িই বা টানে কে, আর তোমার রথযাত্রাই বা কেমন করিয়া হয় ? তোমার বাপ নন্দের দিব্য দিয়া বলি, এই-বার রথটাই বা চালায় কে, একবার আমি দেখে নিই ।”

দীনতাই ভক্তের স্বাভাবিক ধর্ম । ভক্ত প্রণয়কোপে যতই অভিভূত হউন না কেন,—আর সেই অভিমানভরে ভগবানকে যতই কটুকাটব্য বলুন না কেন, সে অভিমান হৃদয়ে অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না ; ভক্তের স্বাভাবিক দৈন্ত আসিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে ;—দীনতার আবরণে সেই অভিমান ঢাকা পড়িয়া যায় ।

বলরাম দাস অভিমানে আত্মাহারা হইয়াছেন সত্য, আর অভিমানভরে প্রাণবন্ধুকে কত কি কটু কথা বলিয়াছেন, তাহাও সত্য, অধিক কি অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য বন্ধপরিকর হইয়াছেন, ইহাও সত্য ; কিন্তু হইলে কি হয়, তত্ত্বস্বভাবমূলত দীনতা আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলিল । তিনি তাঁহার প্রাণবন্ধুর উদ্দেশে দীনহীন কাণ্ডালের যত বলিয়া উঠিলেন—“ওহে

শ্রীবৎসনাঙ্কন ! তুমি আমার আর একটা কথা শোন ।—তুমিই আমার একমাত্র শরণ । আমি তোমার সেবক । তুমি আমার প্রাণের নারক । যদি আমার অল্প শরণ থাকে, তাহা অল্পে বুঝুক তাহ না-ই বুঝুক, সর্কান্তর্য্যানী তুমি তো তাহা ভালরূপেই বুঝিতে পারিবে । ওহে পুতনাপ্রাণ-নাশন ! তোমাকে আর একটা কথা—বেণী নয় আর একটা কথা বলিয়া বিদায় লই । শুনিবে না কি ? বলি, এই যে কোট কোট ব্রহ্মাণ্ড, সেই ব্রহ্মাণ্ডে সেবকের প্রভু কি একটি বই আর দুইটি আছে ? সেবকের যদি এক বই দুই প্রভু না রহিল, আর সেই সেবকের ক্ষতিবৃদ্ধি যদি সেই প্রভু না-ই বৃদ্ধিল, তবে লজ্জা হইবে কাহার ? এই কথাটা তুমি হৃদয়ে বিচার করিয়া দেখ । তোমাকে অধিক আর কি বলিব, তুমিই আমার জীবিতেশ্বর ;—অল্প কেহ নয় ।”

এই বলিয়া অভিমানভবে বলরাম দাস তথা হইতে চলিয়া গেলেন । যাইবার সময় যতদূর দৃষ্ট চলে—পাছু-পাছু চাহিতে-চাহিতেই চলিয়া চলিলেন । এইরূপ চলিতে-চলিতে তিনি সিন্ধুতীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন । সমুদ্রতীরে চক্রতীর্থ । বাকিমুহানা তাহারই পাশাপাশি । চারিদিকেই বামুকারাশি বলরামের প্রাণের মতই ধ্বংস করিতেছে । এত নৈঃশব্দে কবিরাম, আসিবার সময় এত কিরিয়ান-কিরিয়ান থমকিয়ান-ধমকিয়ান চলি-চলি করিয়ান চলিয়ান আসি-লাম ; কিন্তু কই আমার প্রাণবল্লভ তো আমাকে একটি আশ্বাসের বাণী বলিলেন না ; আমাকে ফিরাইবার ক্ষমতা তো কোন চেষ্টা-চরিত্রও করিলেন না ;—এই বিষাদে বলরামের হৃদয় ভরিয়া গেল । তিনি

বিষয়মানে বাঁকিমুহানার সেই বালুকাকীর্ণ প্রান্তরে যাইয়া উপবেশন করিলেন। প্রতিশোধ লইবার প্রবৃত্তি আবার তাঁহার প্রাণে জাগিয়া উঠিল। তিনি তাহারই ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

বলরাম করিলেন কি ? তিনি তাড়াতাড়ি বালুকার তিনখানি রথ তৈয়ারি করিলেন। তাহার পর নয়ন মুদিয়া জগন্নাথ বলরাম ও সূতদ্রাদেবীকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যানযোগে তাঁহাদের মাফাংকার লাভ করিয়া বলিলেন,—“প্রভু হে, আমাকে যদি সেবক বলিয়া মনে হয়, তবে আর বিলম্ব করিও না ; এই রথে শুভ বিজয় কর।”

এই কথা বলিতে-বলিতে বলরাম ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নয়ন হইতে অশ্রুস্রাব অশ্রুধারা গলিয়া পড়িতে লাগিল। সেই ধারা অমৃতনদীর মত তাঁহার সৰ্বশরীর ভাসাইয়া দিতে থাকিল। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আদিমূল জগন্নাথ তাহা জানিলেন। জানিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। থাকেনই বা কি প্রকারে ? যে প্রভু ভক্তবৎসল, যিনি শরণাগতের রক্ষাকর্তা এবং সেবকের সামান্য বেদনাও যিনি সহিতে পারেন না, সেবকের এত দুঃখ-বিষাদ দেখিয়াও কি আর তিনি স্থির থাকিতে পারেন ? তিনি তৎক্ষণাৎ তথাকার সুখসম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতা ও ভগিনীকে সঙ্গে লইয়া বাঁকিমুহানে ভক্ত বলরামের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বালির রথে শুভবিজয় করিলেন। তথাকার রথে কেবল দারুই পড়িয়া রহিল।

বলরাম দাস ধ্যানযোগে তাহা দেখিলেন। হর্ষভরে তাঁহার

হৃদয় ভরিয়া গেল । তিনি তখন অল্পে অল্পে নয়ন মেলিয়া দেখিলেন । তাঁহার কোটিকল্পকৃত স্মৃতির ফললাভ হইয়া গেল । তবুও তাঁহার অভিমানের অন্ত নাই ; তিনি বক্রনয়নে চক্রধারীর দিকে চাহিয়া রহিলেন । তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ ; কিন্তু বাহিরে দুঃখের অভিনয় । পদ্মমুখ ভগবান্ তাহা জানিলেন । পীতবাস হাদিয়াহাসিয়া দাসের প্রতি কহিতে লাগিলেন,—“বলরাম ! তুমি আমার উপর রাগ করিও না । দেখ, আমি তোমার ঘোরতর সন্তাপ দেখিয়াই তথাকার যাত্রা উপেক্ষা করিয়া তোমার কাছে আনিয়া উপস্থিত হইয়াছি । এখন আমি তোমারই আয়ত্ত । তুমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার ।”

প্রভুর শ্রীমুখের এই অমৃতময় কথা শুনিয়া দাসের হৃদয়ের অভিমান দূর হইয়া গেল ; তখনই তিনি মস্তকের উপর অঞ্জলিবদ্ধ হাত দুইটি স্থাপন করিলেন ; প্রভুর চরণতলে পড়িয়া আহি— চিন্তা করিয়া তাঁহার সম্মুখেই শুইয়া পড়িলেন । উঠিয়া আবার কপালে কৃতাজ্জলিপুট করযুগল বিচ্যুস্ত করিয়া গদগদক্ককক্ঠে বলিতে লাগিলেন,—“ওহে চক্রধারি তোমায় নমস্কার । কমলা তোমার পরিচারিকা । বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মা আজ্ঞাকারী । তোমারই আজ্ঞায় দেবরাজ ইন্দ্র, সুর, অসুর, যক্ষ, গন্ধৰ্ব্ব, কিন্নর, সূর্য্য, চন্দ্র, ছত্ৰাশন, নাগ, নৃপতি, চরাচর, পৃথিবী, আকাশ, দিক্‌পাল, সকলেই যাতা-য়াত করিতেছেন ; তুমি সকল লোকের নাথ । সরস্বতী তোমার আজ্ঞাকারিণী । অষ্টনিধি তোমার পরিবার । সিদ্ধ যোগীন্দ্রমুনিগণ ধ্যানে তোমার চরণ চিন্তা করিয়া থাকেন । তাঁহাদের কাছে এ

কীটাপুকীট ছার আমি আর কতটুকু ; কেবল তোমার কাছে দাসখণ্ড  
 লিখাইয়াছি বলিয়াই তো তুমি, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমার কাছে  
 আসিয়াছ,—সহস্রসহস্র লোকের সেবা, সুরপ্রার্থনীর সেবাসত্তার,  
 বহুমূল্য সুকোমল আসন, গীতবাদ্য নর্তন প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়া  
 এই উত্তপ্ত অনাবৃত বানুকাকীর্ণ ভূমিতে বানুর রথে আসিয়া শুভ-  
 বিজয় করিয়াছ ! ধন্য ধন্য প্রভু ; তোমার প্রভুপণার বলিহারি  
 যাই—বলিহারি যাই ! অহো ! মূঢ় মানব তোমার এ করুণার কথা—  
 সেবকের সম্ভাপমোচনের কথা কিছুই জানে না, তাই তাহারা  
 অল্প দেবতার উপাসনা করিতে যার । তাহারা বেন ঠিক—

“গঙ্গা তেজিগ গঙ্গাকূলে । কূপ খোলন্তি ত্বাতুরে ॥  
 সুখা তেজিগ বিষ খাই । মরিবা সম সে তটই ॥”

পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া গঙ্গা তেজিয়া গঙ্গাকূলে কূপ-খনন  
 করে ; সুখা তেজিয়া বিব ভক্ষণ করিয়া মর-জর হইয়া পড়ে ।

কিন্তু নাথ, যে তোমার কিঞ্চিৎ নহিলা অবগত হইয়া অবিরত  
 তোমার ভজনা করে,—তোমার চরণে শরণ গ্রহণ করে, সে  
 ইন্দ্রাদি-পদকেও গণনার মধ্যে জানে না, তোমার বলে বন্দী  
 হইয়া সংসারে আর কাহাকেও ভয় করে না । সর্বদাই মনে  
 করে,—শঙ্খ-চক্র গদা-পাদি যখন আমার সহায় আছেন, তখন  
 আর ভাবনা কিসের ?

প্রভু, আমি তোমার কাছে সর্বদাই অপরাধী । কিন্তু  
 তুমিও যে করুণার সাগর । সে অনন্ত অপার সাগরে সকল  
 অপরাধই তৃণখণ্ডের মত কোথায় ভাসিয়া চলিয়া যায় । সেই

সাহসেই প্রভু, আমি তোমায় আজ যত কিছু অকথা-কুকথা বলিয়াছি । তাহার সমুচিত শাস্তি হউক—আমার জিহ্বায় বজ্রাঘাত হউক ।

নাথ, তুমি যে ভৃত্যের এত সহায়—এত পক্ষ, এতদিন তাহা কেবল ভাসা-ভাসা জানা ছিল, আজ কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখা গেল । প্রভু, আজ নীলাদ্রি-নগরে তোমায় রথযাত্রার মহোৎসব । আজ সেখানে তোমার সুখভোগের আর সীমা-পরিসীমা নাই । কিন্তু তুমি কি-না আজ সেই নীলাদ্রি-নগর ছাড়িয়া, নন্দিবোব-রথ পরিত্যাগ করিয়া, অশেষ সুখভোগ উপেক্ষিয়া, ভ্রাতা ও ভগিনীকে সমভিব্যাহারে লইয়া কাণ্ডাল আমার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ । এখানে কি ভোগ উপভোগ করিবে প্রভু ? মুঢ় আমি বড়ই মন্দ কর্ম্ম করিয়াছি ;—আহা আমিই প্রভুকে এই মহাকষ্টে ফেলিয়া দিয়াছি । আমার গতি কি হবে প্রভু ?”

ভাবগ্রাহী ভগবান্ ভক্তের আত্মনিবেদন শুনিয়া পরম প্রীত হইলেন । প্রীতিভরে ভৃত্যকে আপনার পার্শ্বে বসাইলেন । মুহূ-মধুর হাস্য করিতে-করিতে শ্রীমুখে আদেশ করিলেন,—  
“বলরাম, প্রাণপ্রিয় বলরাম ! বল দেখি, নীলাদ্রি-নগরে আজ আমার উৎসব হয় কি প্রকারে ? ভক্তের ভাবই আমার মূল । ভক্ত ভাবমূল্যে আমার কিনিয়া লয় । তুমি তো আমাকে সেধানকার অনেক সুখের কথা বলিয়া ফেলিলে, কিন্তু—

“অশেষ সুখভাব মোর । ভগত-কথামৃত মার ॥

মোর মহিমা পদে পদে । যে গুণু থিষ সदा ছদে ॥

সে অটে সুখদাতা মোর । মুঁথাই অগ্রতে তাহার ॥

এ কথা সত্য সত্য মোর । তো মনে সংশয় ন কর ॥”

ভক্তের কথামূতই আমার সকল সুখসম্পত্তি । যে জন হৃদয়ে আমার মহিমা পদে-পদে চিন্তা করিয়া থাকে, সে-ই আমার সুখদাতা । আমি তাহারই অগ্রভাগে সর্বদা বিরাজ করিয়া থাকি । আমার এ কথা সত্য সত্য ; তুমি মনোমধ্যে সংশয় করিও না ।”

প্রভুর শ্রীমুখের কথা শুনিয়া বলরাম দাস পরম পরিতোষ লাভ করিলেন । বালির রথে আর প্রাণনায়ককে বসাইয়া রাখিতে তাঁহার ক্লেণবোধ হইতে লাগিল । তিনি তখন আপন দেহরথেই আর এক নূতনতর রথখাতা আরম্ভ করিয়া দিলেন । তিনি তখন হৃদয়মধ্যে চক্রাসনে যতন করিয়া প্রভুকে বসাইলেন । আপন ধৈর্য্যশুভ্রে মনোরূপ পটুডোরি দিয়া প্রভুকে বাধিলেন । আনন্দ দাণ্ডে ( বড়রাস্তায় ) রথ রাখিলেন । তাহাতে কল্পনারজু বন্ধন করিলেন । তাঁহার প্রকৃতিক্রম কলাপিঠিয়াগণ ( গোপজাতি বিশেষ ) আসিয়া রথরজু আকর্ষণ করিতে লাগিল । রথোপরি সুগুণ-সারথী রঙ্গভরে নাচিতে-গাইতে রথ চালাইতে লাগিল । রাজস-বুদ্ধি ছড়িদার হইয়া হস্তে বেত্র ধারণপূর্বক হিংসা ছবুদ্ধি প্রভৃতিকে তাড়াইতে থাকিল । মহত্তর ঘোর ঘণ্টানাদ করিল । শকতর শঙ্খ বাজাইয়া দিল । জাগ্রত পুরুষ পড়িছা-( পণ্ডা-বিশেষ )-রূপে রথ রক্ষা করিতে লাগিলেন । পঞ্চপ্রাণ ব্রাহ্মণ-রূপে সুবুদ্ধিপণ্ডাকে সঙ্গে লইয়া প্রভুর পূজায় বসিয়া গেলেন ।



চতুর্দশ ভুবনের মধ্যে যেখানে যত অপূর্ব সামগ্রী পাওয়া যায়, প্রভুর সম্মুখে সমস্তই একত্রিত করা হইল। পূজা করিয়া প্রভুর ভোগ দেওয়াও হইয়া গেল। নৃপতি মন চৈতন্ত-মন্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া সুষুম্নাদ্বারে বিরাট পুরুষের সম্মুখে অবস্থান করিলেন। আজ্ঞা দিলেন,—ভয়কে মার, আর ক্রোধ, ভাঙ্গস ভাব, কুটিলতা, কপটতা, কুমতি, মিথ্যা, লোভ, মদ, মাৎসর্য, ছদ্ম্ভূত, দাস্তিকতা ও কল্পনা আদি যত লোক,—সকলকে এ দিব্যরথে থাকিতে দিও না, সকলকে মারিয়া দূর করিয়া দাও। মন-নৃপতি এই প্রকার হুকুম দিয়াই প্রভুর শ্রীমুখ ধ্যান করিতে লাগিলেন।

এই অদ্ভুত অপূর্ব রথযাত্রার অবতারণা করিয়া বলরাম দাসের আনন্দ আর ধরে না। তাঁহার আর সংসারের সুখ-সমৃদ্ধি কিংবা দেহগেহ, কিছুরই আশা নাই; রাত্রিদিবস জ্ঞান নাই;—ক্ষুধাতৃষ্ণাও নাই। কেবল একমনে একপ্রাণে এবং একই ভাবে তিনি দাক্ষিণ্যকে ভজনা করিতে লাগিলেন। ভক্তের এই বিশুদ্ধ ভাব দেখিয়া শ্রীহরিও সেই ভাববন্ধনে বাঁধা পড়িয়া গেলেন।

এদিকে নীলাচলনগরে বিষম ব্যাপার বাধিয়া গিয়াছে। অসংখ্য কলাপিঠিয়া নন্দিঘোষ প্রভৃতি রথের দাড়ি ধরিয়া প্রাণপণে টানাটানি করিতেছে, কিন্তু রথ চলা দূরে থাকুক, রথের চাকাও একটু নড়িতেছে না। দেখিয়া শুনিয়া সকলেই অবাক। সকলেই ভাবিয়া চিন্তিয়া অস্থির,—রথ চালাইবার কি বুদ্ধিই বা করা যায়, আর রথই বা চলে না কেন?

কিছুতেই কিছু হইল না দেখিয়া সকলে নৃপতির অগ্রে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং রথের বৃত্তান্ত সমস্তই কীর্তন করিলেন । রাজা গুনিয়া পরম বিস্মিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ রাজ্যের চারিদিকেই টেঁড়া পিটাইয়া দিলেন ; আমার রাজ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র কিংবা স্ত্রী-পুরুষ বালক-বৃদ্ধ যে যেখানে আছি, সকলে সত্বর আসিয়া রথ-রজ্জু আকর্ষণ কর ।

রাজার আদেশে তখনই দেশেদেশে লোক ছুটিল এবং টেঁড়া পিটিয়া রাজার আদেশ জাহির করিতে লাগিল । রাজার আদেশ পাইয়া দেখিতেদেখিতে সহস্রসহস্র লক্ষলক্ষ লোক আসিয়া পুরী-ধাম পূর্ণ করিয়া ফেলিল । সকলেই প্রবলপরাক্রমে রথের রজ্জু আকর্ষণ করিতে লাগিল । কিছু বেথানকার রথ, সেইখানেই রহিয়া গেল । সকলের সমবেত শক্তি রথকে এক চুলও সরাইতে পারিল না ।

ব্যাপার দেখিয়া নরনাথ অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন । মনে-মনে বলিলেন,—হায় ! না জানি আমার কি অভাগার উদর হইল, তাই আজ শত চেঁচাতেও রথ চলিতেছে না । মনের দুঃখে স্মরণ হইয়া নৃপতি তখন আদেশ করিলেন,—“ওহে রাজ্যে যেখানে, যত মত্তমাতঙ্গ আছে, সত্বর লইয়া আইস ।” রাজার এ আদেশও প্রতি-পালিত হইল । চারিদিক হইতে শতশত মদমত্ত হস্তী আনয়ন করা হইল । রাজার আদেশে সেই সকল হস্তী সুসজ্জিত করিয়া রথে সংবোদ্ধিত করা হইল । মাহুতগণ ঘনঘন অক্ষুণ্ণের তাড়না করিতে লাগিল । এদিকে স্বয়ং প্রতাপরুদ্র রাজা জগন্নাথের নানামতে পূজা

করাইয়া কোনরে কাপড় কষিয়া রথরজ্জু ধারণ করিলেন । রাজা নিজে আসিয়া রথের দড়ি ধরিয়াছেন, দেখিয়া চারিদিকের লোক আসিয়া মহাব্যগ্রতার সহিত নন্দিঘোষ রথখানিকে ‘গুড়কে পিঁপড়ার মত’ বিরিয়া ফেলিল । চারিদিক হইতে উলুউলু ধ্বনি চটপট করতালি ধ্বনি এবং হরিবোল ধ্বনির ধুম পড়িয়া গেল । সে আনন্দ-উল্লাস দেখে কে ? সকলে রথের দড়ি ধরিয়া যথাশক্তি টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল । কিন্তু রথ কিছুতেই চলিল না । রাজা ও অগ্ৰাণ্য সকল লোকই প্রাণামুপরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন এবং যে যেখানে পাইলেন, যাইয়া বসিয়া পড়িলেন ।

তখন মহারাজ মনেমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আমি নিশ্চয়ই প্রভুর পাদপয়ে অনেক অপরাধ করিয়াছি । তাই রথ কিছুতেই চলিতেছে না । সে যাহা হউক, ব্যাপারখানা কি, একবার বুঝিয়া দেখিতে হইতেছে । এই বলিয়া রাজা দুঃখিতমনে কুশাননে শয়ন করিয়া রহিলেন । মনের সন্দেহ মিটাইবার আর অন্য উপায় নাই দেখিয়া, সেই প্রভুর পাদপয়েই মনপ্রাণ সমর্পণ করিলেন ।

অসুখ্যামী নারায়ণ তখনই তাহা জানিতে পারিলেন । স্বপ্ন-চ্ছলে রাজাকে কহিলেন,—“রাজন্ ! তুমি চিন্তা করিতেছ কেন ? আমি তোমাকে বাহা বাহা বলি, তাহা শুদ্ধচিত্তে শ্রবণ কর ।—

“মোর ভক্ত যেট জন । মো নাম করই গায়ন ॥

সে কেবে অশুচি মুহই । সর্বনা শুচিবস্তু দেহী ॥”

দেখ, যে ব্যক্তি আমার ভক্ত,—দিনযামিনী আমার নাম-

গান করিয়া আনন্দে নিমগ্ন হইয়া থাকে, সে কখনও অশুচি হয় না ; তাহার দেহ, প্রাণ, আত্মা সমস্তই শুচি,—শুচি হইতেও পরম শুচি ।

শুচি অশুচি কিংবা পবিত্র অপবিত্র বিচার প্রাকৃত দেহেই সম্ভবে । ভক্তের দেহ অপ্রাকৃত, সুতরাং তাহা নিত্যা পবিত্র । শুচি-অশুচি কিংবা পবিত্র-অপবিত্র বিচার তাহাতে চলিতেই পারে না । নরনাথ ! ভক্ত-চরিত্র বড়ই দুর্লভ ।

দেখ মহারাজ, বলরাম দাস আমার প্রিয় ভক্ত । সে মহাহর্ষমনে আমার কাছে আদিয়াছিল । সেবকগণ তাহাকে নারিষা ধরিয়া, তাড়াইয়া দিল । তাই সে অভিমানবশে চক্রতীর্থে চলিয়া গেল । সে ছঃখমনে বাঁকিমুহানার বাইয়া বসিল । প্রাণে-প্রাণে আমার পাদপদ্ম চিন্তা করিতে লাগিল । আমি তাহা জানিতে পারিলাম । তৎক্ষণাৎ তাহার পার্শ্বে বাইয়া মিলিত হইলাম । সে আমার যে প্রকার মুখ দিল,—যে প্রকার রথযাত্রা করিল, অস্তুর কথা কি, ইন্দ্রাদি দেবগণেরও তাহা অনুষ্ঠান করা কঠিন । তুমিই বা তাহার ভাব জানিবে কেমনে ? তাই আমি সেইখানেই রহিয়াছি । এখানকার রথ চলিবে কি প্রকারে, ভক্ত যে ভাবরজ্জুতে আমার বাধিয়া রাখিয়াছে ; সে বন্ধন তো আর মোচন করিতে পারিতেছি না । এতো দড়ির বাধন নয়, যে ফুন্ করিয়া খুলিয়া ফেলিব ? ভক্তের ভাবের বাধন,—শক্ত বাধন ! ভক্তের সহিত আমার যে কত ঘনিষ্ঠতা—কত অভিন্ন ভাব, তাহা সকলে জানে না ; সে কথাও একটু বলি শুন,—

“ভগত মোহর শরীর । মুহি তাহাক প্রাণেশ্বর ॥  
 ভগত মোর ভিন্নাভিন্ন । কেবেহেঁ মুহে হে রাজন ॥  
 ভগত রক্ষণ নিমন্তে । চক্র মুঁ ধরিসছি হস্তে ॥  
 ভগত দুঃখ সুখ যেতে । মুঁ সিনা ভুঞ্জুখাই নিত্যে ॥”

ভক্ত আমার শরীর । আমি তাহার প্রাণেশ্বর । রাজন্ !  
 ভক্তে ও আমাতে কখনও ভিন্নভাব নাই ; আমরা চিরদিনই  
 অভিন্ন । আমার হস্তে এই যে চক্র দেখিতেছ, ইহা কাহার নিমিত্ত  
 ধারণ করিয়া আছি ? আছি কেবল ভক্তেরই নিমিত্ত,—এই চক্রে  
 ভক্তের বৈরি-নিপাত করিয়া তাহাকে নিরাপদ করিবার নিমিত্ত ।  
 ভক্তের যত সুখ যত দুঃখ, আমাকেই তো তাহা নিত্য উপভোগ  
 করিতে হয় ? ফল, ভক্তের সুখেই আমার সুখ, ভক্তের  
 দুঃখেই আমার দুঃখ । ভক্ত সুখ-দুঃখ-নিরপেক্ষ । সে আমার উপর  
 সকল ভার চাপাইয়া নিশ্চিন্ত আছে । ভাবনা তো যত আমারই ।  
 ভক্ত দুঃখ পাইলে যখন সে দুঃখ আমাকেই ভোগ করিতে হইবে,  
 তখন স্বার্থের খাতিরেও তো তাহার দুঃখ দূর করিয়া দেওয়া  
 আমার দরকার । ভক্তের সুখেই আমার সুখ হয় বলিয়া আমি  
 সদাসর্বদা ভক্তের সুখানুসন্ধানই করিয়া থাকি । ভক্তের দুঃখ  
 বিদূরিত করা এবং তাহাকে নিত্য সুখে নিমগ্ন করাই আমার কার্য ।

রাজন্ ! যাহা বলিলাম, তাহাতে মনে অণুমাত্র সংশয় করিও  
 না । ইহা বার-পর-নাই সত্য কথা । অতঃপর যাহা বলিতেছি,  
 তাহাও অবহিত-চিত্তে শ্রবণ কর । যদি তোমার নন্দিঘোষ রথে  
 আমার যাত্রা করাইবার একান্ত ইচ্ছাই হইয়া থাকে, তবে তুমি এক

কার্য্য কর ;—যাহারা আমার ভক্তকে অকারণ দণ্ড দিয়াছে, সেই সকল সেবককে শীঘ্র ডাকাও ; ডাকাইয়া জোড়াজোড়া করিয়া তাহাদের বাঁধাও । তাহাদের গলায় কুড়ুল বাঁধিয়া দিবে ; তাহারা দস্তে ভূণগুচ্ছ ধারণ করিবে ; তাহাদের পিছন হইতে গলা ধাক্কা দিতে-দিতে আমার ভৃত্য বলরাম দাসের সম্মুখে লইয়া আসিবে ; তাহার চরণতলে সকলে লুটাপুটি খাইতে থাকিবে ; আর তুমিও স্বয়ং বলরাম দাসকে কোলে বসাইয়া অনেক গৌরব-সম্মান-সহকারে নন্দিদোষ রথে লইয়া আসিবে ; রথের উপর বসাইয়া পরম আদরে তাহার মাথায় পাটশাড়ীর শিরোপা বাঁধিয়া দিবে । এইরূপ পূজা পাইয়া সে যখন বেগে রথ চালাইবার অশ্রু আদেশ করিবে, তখনই রথ অবাধে চলিতে থাকিবে, নচেৎ কিছুতেই চলিবে না । রাজন্ ! আমি সত্যসত্যই বলিতেছি,—

“মুহিঁ ছাড়িলি নীলাচল । ভগতভাব মোর মূল ॥

ভগত যিব মোর যেনে । মুহিঁ নিশ্চয় যিবি তেপে ॥”

ভক্তের বিগুহ্ণ ভাবই আমার যাহা কিছু সকলই । সেই ভক্তের আকর্ষণেই আমি নীলাচল ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছি । ভক্ত আমার যে দিকে গমন করিবে, আমিও নিশ্চয় সেই দিকেই গমন করিব । ভক্ত নীলাচলে চলিলে আমিও তাহার সহিত নীলাচলে চলিয়া যাইব ।

এই কথা বলিয়া ভগবান্ অস্তর্ধান করিলেন । নৃপতিও ব্যস্ত-সমস্তভাবে উঠিয়া দাসদৌবারিকাদি সেবকবৃন্দকে ডাকাইলেন, জোড়াজোড়া করিয়া তাহাদের বাঁধাইলেন ; সকলের গলদেশে

কুঠার ঝুলাইয়া দিলেন ; দস্তে তৃণগুচ্ছ ধারণ করাইলেন এবং পাছু-পাছু গলাধাক্কা দিতে-দিতে ভক্ত বলরাম দাসের সম্মুখে সকলকে লইয়া উপস্থিত হইলেন । সকলেই ভক্তের চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন । উঠিয়া আবার কপালে কৃতাজলি হস্ত অর্পণ করিলেন । বলিলেন,—দেব ! আমরা বড় অপরাধী, অপরাধের উপযুক্ত দণ্ডে আমরা পাইয়াছি । আর কেন, এইবার আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন ; উঠুন—নীলাচলনগরে শুভ বিজয় করুন । ধন্য আপনার ভক্তির মহিমা ! অস্ত্র আমরা তাহা কি প্রকারেই বা বৃদ্ধিতে পারিব ?

নৃপতিও নধুর সন্তোষে আপ্যায়িত করিয়া অনেক আদরগোরবে বলরাম দাসকে আপনার কোলের উপর বসাইলেন । ধন-রত্ন বসন-ভূষণে তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন । অশ্বের উপর আরোহণ করাইয়া মহা মহোৎসব করিতেকরিতে নীলাচলনগরে নন্দিঘোষ রথের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । পরে স্বয়ং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া রথের উপর লইয়া গেলেন । প্রভুর সম্মুখে বসাইয়া পাট-শাড়ীর শিরোপা তাঁহার মাথায় বাঁধিয়া দিলেন এবং বিনয়ের সহিত বলিলেন,—ভক্তবর ! এইবার দয়া করিয়া রথযাত্রা করাও ; সকলই তো তোমার আয়ত্ত ।

বলরাম দাস রাজার আদর-আপ্যায়নে এবং স্নানধুর সন্তোষে মনেমনে মহা হর্ষ অনুভব করিলেন । প্রভুর প্রতি প্রেমনেত্রে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন,—

“বোইলে—নমো মহাবাহু । ভগতবৎসল বোলাউ ॥

নার করুণামহামরু । কিঞ্চিতে ছব করু দারু ॥

এবে মূ' কহঅছি তোতে । ভো প্রভু বিজে কর রথে ॥  
তুরিতে রথ চলি যাউ । প্রভুমহিমা রহি থাউ ॥”

ওহে মহাবাহু ! তোমায় নমস্কার । তুমি নাকি আপনাকে ‘ভক্ত-  
বংশল’ বলাইয়া থাক । তোমার নাম নাকি করুণার মহামেরু ।  
উচ্চতায় নেরুপর্বতের বরং পরিমাণ হয়, কিন্তু তোমার করুণার  
আর পরিমাণ হয় না ; তাই বুকি তুমি করুণামহামেরু । তাই তোমার  
কাছে কিঞ্চিং করুণা ভিক্ষা করি,—তোমার দারুবিগ্রহ একটু দুর্বল  
করিয়া দাও । বিশ্বস্তরমূর্ত্তি সংবরণ করিয়া রথে গুভ বিজয় কর ।  
রথও স্বরিতগতিতে চলিতে থাকুক । ভক্তের প্রভু তুমি,—গতি  
তুমি, তোমার মহিমা চিরতরে বিশ্ব ভরিয়া রহিয়া যাউক ।

ভক্ত বলরাম দাস নৃপতিদত্ত সম্মান-মর্যাদা লাভ করিয়া ইতর-  
জনের স্থার আত্মবিস্মৃত হইলেন না, অহঙ্কারে ক্ষীত হইয়া উঠিলেন  
না । আর সেই অহঙ্কারভরে স্বয়ং কোন হুকুমও চালাইলেন না ।  
অধিকন্তু তাঁহার সকল সম্মান সকল মর্যাদার মূল সেই প্রভুরই  
নিকটে করুণা ভিক্ষা করিলেন । ভক্ত ও ভগবান্ একপ্রাণ কিনা,  
তাই ভক্ত বলরাম প্রাণেপ্রাণে প্রভুর প্রেরণা বৃদ্ধিতে পারিলেন ।  
তিনি অতি দীনহীনের মত কৃতাজ্জলিপুটে সকলের প্রতি বলিয়া  
উঠিলেন,—আর বিলম্ব নয়, তোমরা এইবার রথরজ্জু আকর্ষণ  
কর, প্রভুর গুভ বিজয় হইবেই হইবে ।

ভক্তের কথা শুনিয়া অননি কলাপিঠিয়াগণ রথের দড়ি ধরিয়া  
টান দিল । সকলেই জয়জয়-হরিহরি-ধ্বনি করিতে থাকিল । বিবিধ  
বাজনা বাজিয়া উঠিল । রমণীগণ হলাহলি দিতে লাগিল । সেবকগণের



ঘনঘন ঘণ্টা-কাংস্র-নিমাদ সেই সংমিশ্রিত শব্দকে আরও তুমুল করিয়া তুলিল ।

চারিদিকেই এই আনন্দোল্লাস দেখিয়া ভগবান্ নৃপতির প্রতি পবন প্রসন্ন হইলেন এবং ভক্তের মহত্ব রক্ষা করিবার নিমিত্ত রথ-যাত্রা আরম্ভ করিয়া দিলেন । ঘন ঘোর গর্জনে তালধ্বজ রণ চলিতে লাগিল, সঙ্গেসঙ্গে বিজয়া এবং নন্দিঘোষ রথও চলিতে আরম্ভ করিল । নে রথের দৌড়ই বা দেখে কে ? রথের দড়ি কোথায় পিছন দিকে পড়িয়া রহিল, আর পাখীর মত শূন্যনাগেই যেন রথ তিনখানি উড়িয়া যাইতে লাগিল । পলক না পড়িতে-পড়িতে তিনখানি রথই গুণ্ডিচানগরে আসিয়া প্রবিষ্ট হইল ।

এই বিচিত্র ব্যাপার দেখিয়া, স্বয়ং মহারাজ এবং অত্যাণ্ড বত লোক, ভক্ত বলরামের চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়া নানাপ্রকার প্রশংসা করিতে লাগিলেন । তখন ভক্ত ও ভগবানের জরজর-রবে চারিদিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল । সে দৃশ্য যার-পর-নাই মধুর,— যার পর নাই মর্ম্মস্পর্শী ! কেহকেহ ভক্তের দিকে চাহিয়া বলিতেছেন,—ওহে তোমার জীবন ধন্য ; তুমি নারায়ণকে আপনার বশ করিয়া ফেলিয়াছ । আবার কেহকেহ ভগবানের দিকে তাকাইয়া বলিতেছেন,—অহো প্রভু, ধন্য তোমার মহিমা ; তুমি ভক্তের গৌরব রক্ষা করিলে । অনন্তর সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—

“এণু এ ব্রহ্মাণ্ডমধোন । হরিভগত বড় জন ॥  
যে সাধুজনকু ভজই । সে নিশেচ হরিকি লভই ॥  
যে বা সাধুরে দ্রোহ করি । সে নিশেচ শ্রীহরি-বইরি ॥”

এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে হরিভক্তই শ্রেষ্ঠ । যে ব্যক্তি সাধুজনের ভজনা করে, নিশ্চয়ই সে শ্রীহরিকে লাভ করিয়া থাকে । আর যে জন সাধুর দ্রোহ আচরণ করে, নিশ্চয়ই সে শ্রীহরির বৈরী হইয়া থাকে ।

এইকথা বলিয়া সকলেই সেই ভক্তের ভাব চিন্তে চিন্তা করিতে-করিতে আপন-আপন আবাস অভিমুখে গমন করিলেন । সেবকগণও পরমানন্দে প্রভুকে শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে লইয়া গিয়া যে ষাহার সেবায় লাগিয়া গেলেন । ভক্তের বিজয়-দুন্দুভি-নাদে দিগ্দিগন্ত পূর্ণ হইয়া উঠিল ।

অহো ভগবন, ধন্য তোমার ভক্ত-বাৎসল্য ! বিগুহ্ণ ভক্তির কথা দূরে থাকুক, সামান্য ভক্তির আভাস দেখিলেই তুমি ভুলিয়া যাও ! তাই চরিত্রহীন বেশ্যাসঙ্গী বলরাম দাসের প্রতিও তুমি এতদূর কৃপা বিস্তার করিলে । নাথ, ইহা হইতেই বেশ বৃদ্ধিতে পারা যার যে, ষাহারা সদাচার রক্ষা করিয়া, বিগুহ্ণ চরিত্র বজায় রাখিয়া, নিরপরাধে তোমার ভজনা করেন, তাঁহাদের প্রতি তোমার কতই না করুণা—কতই না প্রীতি ।

প্রভু, সংসারের পিচ্ছিল-পথে চলিতে-চলিতে প্রমত্ত জীবের তো পদেপদে পদস্থগন হইবারই কথা । সেই হতভাগ্য পতিত জীবের প্রতি তোমার এতদূর দয়া না থাকিলে কি আর তোমার 'পতিত-পাবন' বলিয়া কেহ ডাকিত,—না, কেহ তোমার বিগুহ্ণ ভজনপথ অবলম্বন করিত ? নিরপরাধের প্রতি করুণা তো সকলেই করিয়া থাকেন । সাপরাধের প্রতি করুণা বিতরণ করাই না করিন । সে শক্তি কি সকলের আছে ? সাপরাধ

জনেও তোমার এই অবাধ করুণার ধারা বর্ষণ হইতে দেখিয়া  
আমাদের কেবল শ্রীরূপগোস্বামিপাদের এই মহাবাক্যই মনে  
পড়ে,—

ভৃত্যস্ত পশুতি গুরুনপি নাপরাধান্  
সেবাং কৃতামপি মনাগ্ বহুধাত্ম্যৈতি ।  
আবিষ্করোতি পিশুনেষপি নাভ্যসূদ্রাং  
শীলেন নিশ্চলমতিঃ কমলেক্ষণোহয়ম্ ॥

আর সঙ্গেসঙ্গে কবিরাজগোস্বামীরও পয়ারের মধুর বক্তার  
আমাদের কাণের কাছে বাজিয়া উঠে,—

“ঈশ্বর স্বভাব—ভক্তের না লয় অপরাধ ।  
অল্প সেবা বহু মানে, আত্মপর্য্যন্ত প্রসাদ ॥”

( চৈঃ চং, অন্ত্য, ১ম পং )



## দীনবন্ধু দাস ।

অবন্তীনগরে উত্তম ব্রাহ্মণকুলে দীনবন্ধুর জন্ম । পত্নী মালতী, দুইটা পুত্র এবং একটি পুত্রবধু লইয়াই তাঁহার সংসার । ভগবানের কি যে কৃপা, বলা যায় না ; এই ব্রাহ্মণ-পরিবারের পাঁচজনেই যেন একই ছাঁচে ঢালা ; দেহ ও আকার কেবল ভিন্ন ভিন্ন ; কিন্তু মন প্রাণ সবই এক । সকলেই নিয়ত কৃষ্ণকথা কহিতে ও শুনিতে ভালবাসেন, হরিচরণে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন । সাধুর মুখে হরিকথা শুনিতে পাইলে তাঁহারা সকল ভুলিয়া যান । অসংসঙ্গে কাহারও আস্থা নাই । মিথ্যা কথা কেহই কহেন না । পরহিতসাধনই সকলের জীবনব্রত । সাধুসজ্জনের চরণসেবন ও দুঃখি-দরিদ্রকে অন্নবস্ত্রাদি বিতরণ করিতে সকলেই মুক্তহস্ত । তাঁহাদের দ্বারে আসিয়া অতিথি-ফকির কাহাকেও নিরাশ হইয়া ফিরিতে হয় না । অতিথি-সেবাই যে গৃহীর পরম ধর্ম এবং অতিথিকে নিরাশ করিলে সেই অতিথি যে গৃহস্থকে আপন পাপরাশি অর্পণ করিয়া তাহার পুণ্যপুঞ্জ লইয়া চলিয়া যান, এ কথা তাঁহারা সকলেই উত্তম বুঝিয়াছেন । তাই তাঁহারা শ্রদ্ধাপূতহৃদয়ে যথাশক্তি অতিথির আশা পূর্ণ করিয়া থাকেন । না পারিলে অন্ততঃ সুমিষ্ট বাক্যেও তাঁহাদের সন্তোষ সম্পাদন করেন । তথাপি 'না' কথাটি কাহারও প্রতি প্রয়োগ করেন না ।

ফুল ফুটিলে গন্ধ ছাপা থাকে না,—এই ব্রাহ্মণ-পরিবারের যশঃসৌভ দিন-দিন দিগদিগন্তে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, প্রকৃতির রাজ্য ছাড়াইয়া ভগবানের অপ্রাকৃত রাজ্যেও সমাচার প্রচারিত হইয়া পড়িল । না পড়িবেই বা কেন ? অতিথির বেশে যাহারা আমাদের আবাসে আগমন করেন, তাঁহাদের সকলকে কি আমরা চিনিতে পারি ? অতিথির ভিতর ভালও আছে, মন্দও আছে ; এ-রাজ্যের লোকও আছে, আর সে-রাজ্যের অর্থাৎ সেই অপ্রাকৃত ভগবদ্রাজ্যের লোকও আছে । অতিথিসেবায় নিষ্ঠা থাকিলে একদিন-না-একদিন এক-আধজন সে-রাজ্যের অতিথিরও তো আসিবার কথা । সে-রাজ্যের লোকের আগমন হইয়া গেলে আর সেখানে এখানকার খবর পঁছছাইতে বড় বিলম্ব হয় কি ? হয়-না বলিয়াই তো দীনবন্ধুদাসের সংবাদ সেই দীনবন্ধুর কর্ণে যাইয়া প্রবেশ করিল ।

সংসারে আমরা নানা প্রকার ব্যস্ততা দেখিতে পাই, কিন্তু ‘অমুক আগায় ভালবাসে’ এই কথা জানিতে পারিলে, তাহাকে পাইবার জন্ত, তাহার কাছে যাইবার জন্ত—‘বেড়া নাড়া দিয়া গৃহস্থের মন বুঝা’র মত তাহাকে একটু নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিবার জন্ত ভগবানের যে প্রকার ব্যস্ততা, তাহার সহিত সাংসারিক তুচ্ছ ব্যস্ততার তুলনাই হয় না । তাই দীনবন্ধুদাসের কথা শুনিবামাত্রই ভগবানের আসন টলিল । যোগি-ঋষিগণ সমাধি-যোগেও যাহার দর্শন পাইয়া উঠেন না, সেই ব্রহ্মাণ্ডনাথ আপনিই স্বরিতগতিতে দীনবন্ধুদাসের উদ্দেশে অবন্তীনগরে আগমন করি-

লেন। আসিয়াই ভক্তের ভীষণ অগ্নিপরীক্ষার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তক্ষক নাগকে আহ্বান করিয়া বলিয়া দিলেন,—  
তুমি সত্বর দীনবন্ধুদাসের ভবনে যাও,—তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রকে দংশন কর।

ভগবানের আদেশে তক্ষক নাগ তৎক্ষণাৎ যাইয়া দীনবন্ধুদাসের জ্যেষ্ঠপুত্রকে দংশন করিল। তক্ষক-বিষের অসহ্য বাতনায় ছটফট করিতে-করিতে তাহার জীবনীলারও শেব হইয়া গেল। এই আকস্মিক সর্বনাশে সকলেরই মস্তকে যেন শত সহস্র বজ্র প্রবলবেগে আঘাত করিল। সকলেই শবের চারিদিকে ঘিরিয়া বসিয়া তাহার গুণ বিনাইয়া-বিনাইয়া উচ্চনাদে কাঁদিতে লাগিলেন। শোকের আর সীমা-পরিসীমা নাই। সে দৃশ্য দেখিলে পাষণ্ডও বিদীর্ণ হইয়া যায়।

এমন সময়ে অবন্তীনগরের রাজপথে এক অপূর্ব সন্ন্যাসী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। তাঁহার হস্তে দণ্ড ও কমণ্ডলু। সর্লাঙ্গ বিহ্বলিত-ভূষিত। পরিধান কাষায় বসন। কণ্ঠে তুলসীর মালা সংলগ্ন। তাঁহার কমণ্ডলু রূপ দেখিলে বিশ্বসংসার ভুলিয়া যাইতে হয়। সন্ন্যাসী রাজপথের দুইধারে যাহাকে দেখেন তাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন,—হাঁগা দীনবন্ধুদাসের বাড়ী কোথায় গা?

সন্ন্যাসী ঠাকুর এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে-করিতে দীনবন্ধুদাসের বাড়ীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই—‘দীনবন্ধুদাস ও দীনবন্ধুদাস!’ বলিয়া উচ্চ বরে ডাকিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর আহ্বানধ্বনি ক্রন্দনকোলাহল ভেদ করিয়া দীনবন্ধুদাস প্রভৃতি

সকলেরই কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল । সন্ন্যাসীর স্বরের কি যে মোহিনী শক্তি বলা যায় না ; সেই সুধা-সুমধুর স্বরে সকলেই যেন বিমুগ্ধ হইয়া পড়িল, শোকতাপ যেন সকলেই ভুলিয়া গেল, সঙ্গেসঙ্গে ক্রন্দনের উচ্চরোলও থামিয়া গেল । দীনবন্ধু দাস তৎক্ষণাৎ মুখে একটু জল দিয়া, অশ্রু-লালা প্রভৃতি প্রক্ষালন করিয়া, ছারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ভুবনমোহন সন্ন্যাসিমূর্তি দেখিয়া আনন্দভরে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন । উঠিয়া কৃতাজ্জলি-করযুগল কপালে রাখিয়া সন্ন্যাসীকে বিনয়সহকারে বলিলেন,—ঠাকুর গো, এ অধমের প্রতি কি আদেশ করিতেছেন ?

দীনবন্ধুদাসের কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী বীণা-বিনিন্দিত-স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—ওহে দীনবন্ধুদাস ! শুনিতে পাই, তুমি নাকি পরম আদরে অতিথিসেবা করিয়া থাক,—দীনভূঃখীকে অকাতরে অন্ন বস্ত্র বিতরণ করিয়া থাক ? তোমার এই কীর্তিকাহিনী শুনিয়াই আজ আমি তোমার কাছে আসিয়াছি ; তুমি পূতচিভে আমাকে অন্ন ভোজন করাও ।

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া দীনবন্ধুদাস তাঁহাকে ভক্তিপূর্নক একখানি আসন দিয়া বলিলেন,—ঠাকুর গো, এই আসনে দয়া করিয়া একটু বসুন, আমি আসিতেছি ।

এই বলিয়া দীনবন্ধু বাটীর ভিতর স্ত্রীপুত্রাদির নিকটে যাইয়া বলিলেন,—দ্বারে অতিথি আসিয়া ভোজন ভিক্ষা করিতেছেন, এদিকে পুত্রের যতদেহও তো পড়িয়া রহিয়াছে ; এখন তোমরা পূতচিভে অতিথিসেবা করিতে পারিবে কি না, শীঘ্র জামায় বল !

দীনবন্ধুদাসের অতিথিভক্তিময় বাক্য শ্রবণে তাঁহার পত্নী, পুত্রবধু ও কনিষ্ঠ পুত্র এককণ্ঠে কহিয়া উঠিলেন,—

“মলে ত ন আসই আউ । অতিথিসেবা আগ হেউ ॥”

মরিলে তো আর কেহ ফিরিয়া আসে না, আমাদের অতিথিসেবাই সর্বাগ্রে হউক । অতিথিকে নিরাশ করা ভাল নয় ।

এই কথা শুনিয়া দীনবন্ধুদাস অতিশয় আনন্দিত হইলেন । একখানি ‘মসিনা’ (মাছ) আনিয়া মৃতপুত্রকে তাহাতে শয়ন করাইলেন এবং জড়াইয়া দড়িতে বাঁধিয়া গস্তুরি-মধ্যে (ভিতরকার ঘরে) লুকাইয়া রাখিয়া দিলেন । সকলে মিলিয়া ঘর-দ্বার ‘লেপা-পৌছা’ করিলেন, স্নান করিয়া শুদ্ধভাবে রন্ধন চড়াইয়া দিলেন । রন্ধন শেষ হইয়া গেলে দীনবন্ধুদাস সন্ন্যাসীকে অন্তরে ডাকিয়া আনিলেন । তাঁহাকে দিব্য আসনে বসাইয়া অন্নব্যাঞ্জন পরিবেশন করিলেন ।

সন্ন্যাসী অন্নব্যাঞ্জনাদি দেখিয়া যেন একটু অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—“ওহে, তোমরা করিয়াছ কি, আমিষ রন্ধন কর নাই ? আমিষ না হইলে তো আমার আহারই হইবে না ; অগত্যা আমাকে ফিরিয়াই যাইতে হইবে দেখিতেছি ।”

অতিথিসেবাপরায়ণ ব্রাহ্মণ-পরিবার তখন সন্ন্যাসীকে সাহুনেরে বলিলেন,—ঠাকুর ! অন্নক্ষণ অপেক্ষা করুন, আমরা এখনই আমিষ রন্ধন করিয়া দিতেছি । বৈষ্ণবসন্ন্যাসিগণ সাধারণতঃ নিরামিষ আহারই করিয়া থাকেন । তাই আমরা সেই প্রকার আয়োজনই



করিয়াছি । ঠাকুর ! আমাদের এই অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা করিতে আঞ্জা হউক ।

সন্ন্যাসী সেই আসনে বাক্যহীন হইয়া বসিয়াই রহিলেন । এদিকে যতদূর সম্ভব সম্ভব মৎস্য সংগ্রহ ও পাক করা হইয়া গেল । সন্ন্যাসীর পাত্রে সেই আমিষ পরিবেশন করিয়া তাঁহাকে ভোজনের জন্ত অনুরোধও করা হইল । কিন্তু তবুও সন্ন্যাসী আহাৰ করিলেন না । তিনি আবার এক নূতন কথা তুলিলেন । বলিলেন,—ওহে, তোমরা তো একখানি পাত্রেই ভাত বাড়িয়াছ; আমি তো একা-একা কখনই খাই না ; তোমরা বাড়ীতে যে কয়জন আছ, সকলেরই পাতা হউক, তাতে ভাত বাড়া হউক, ভরিতরকারি সব দেওয়া হউক, সকলে আসিয়া খাইতে বসিয়া যাও, তবে আমি ভোজন করিব, নচেৎ এই তোমাদের অন্নব্যঞ্জনাদি সকলই পড়িয়া রহিল, আমি চলিলাম ।

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া তাঁহারা চারিজনে চোখ ঠাঠাঠা করিতে লাগিলেন । সকলেই ভাবিলেন,—আমরা যদি খাইতে না বসি, তাহা হইলে সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই ভোজন করিবেন না,—নিরাশ হইয়া চলিয়া যাইবেন, অতএব সন্ন্যাসীর সহিত আহাৰ করিতে বসাই ভাল । অতিথিসেবা তো হইবে, তাহার পর যাহা হইবার হউক ।

আবার চারিখানা পাতা করিয়া তাহাতে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি পরিবেশন করা হইল । কেবল আমিষটা তাহাতে বাদ দেওয়া রহিল । ইহা দেখিয়া সন্ন্যাসী যেন একটু কোপপ্রকাশ করিয়া বলিলেন,—ওহে, তোমাদের পাত্রে যে মাছ পরিবেশন করিলে না ?

বলি ব্যাপারখানা কি ; ও মাছে কি বিব মাখানো আছে ? ওঃ, জানিলাম,—তোমরা কার-পর-নাই কপট । এই ভোনাদের ভাত-টাত সকলই পড়িয়া রহিল, আমি চলিলাম । এই বলিয়া সন্ন্যাসী আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন ।

দীনবন্ধুদাস বিষম সমস্যায় পড়িয়া গেলেন, পত্নী-পুত্রকে কাছে ডাকিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন ;—এখন করা যায় কি ? পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে—সেই মৃতদেহ বাড়ীতে পড়িয়া রহিয়াছে, তাই আমরা আশিষ খাইতে চাহিতেছি না । সন্ন্যাসী একথা জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই ভোজন করিবেন না । তাহার অপেক্ষা চুপেচাপে মাছ-ভাত খাওয়াই ভাল । অতিথিসেবা ত সিদ্ধ হইবে, তার পর যাহা হইবার হয় হউক । ইহা ভাবিয়া সকলেই পাতে মাছ লইয়া সন্ন্যাসীর দিকে তাকাইয়া রহিলেন । সকলেরই মনের ভাব—সন্ন্যাসী একবার ভোজনে বসিলে হয়, আমাদের মনোবাঞ্ছা সুসিদ্ধ হইয়া যায় ।

সন্ন্যাসী যাহা-যাহা বলিতেছেন, আজ্ঞাবহ ভূতের মত চারিঙ্গনে তখনই তাহা সম্পন্ন করিতেছেন । কিন্তু এততেও সন্ন্যাসীর মন পাওয়া গেল না । তাঁহার ভোজন করাও আর হইল না । সন্ন্যাসী আশার এক অভিনব আপত্তি উত্থাপন করিলেন । এ আর আর রাগ দেখাইয়া নয়, তাঁহার সেই ভুবন-ভুলানো হাঁসি দেখাইয়া তিনি দীনবন্ধুদাসকে বলিতে লাগিলেন,—ওহে, আমি আসিবার সময় গ্রামেগ্রামে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, তুমি তোমার সহধর্মিণী, দুইটা পুত্র ও একটি পুত্রবধু লইয়া পাঁচজনে এই গৃহে

বাস করিয়া থাক । এখন দেখিতেছি, তোমরা চারিজনে চারিথানা পাতা করিয়াছ । তোমার আর একটি পুত্র কোথায় ? তাহাকে লইয়া আইস । তাহার পাতা হউক, তাহাতে অন্নব্যঞ্জনাদি দেওয়া হউক, সে আহারে উপবেশন করুক, তবে আমি ভোজন করিব । যাও,—শীঘ্র যাও, তোমার সেই ছেলোটিকে সত্বর লইয়া আইস ।

এই কথা শুনিয়া দীনবন্ধুদাসের হৃদয়ের বল-ভরসা সংশ্লিষ্ট কোথায় উড়িয়া গেল, শরীর থরথর কাঁপিতে লাগিল । মুখ দিয়া একটি কথাও ফুটিয়া বাহির হইল না । তিনি কেবল ছলছল-নেত্রে সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া রহিলেন । যেন কত অপরাধী ।

দীনবন্ধুদাসের এইপ্রকার ভাবান্তর দেখিয়া সন্ন্যাসী তাঁহাকে বলিলেন,—ওহে, তোমার এত ভয় কিসের ? কপটতা ছাড়িয়া সত্য করিয়া বল—তোমার আর এক পুত্র কোথায় ?

তখন চারিজনেই সন্ন্যাসীর চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন । দীনবন্ধুদাস তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—ঠাকুর, সত্যকথা বলি, শ্রবণ করুন । আমার সেই ছেলোটী সর্পাঘাতে মারা পড়িয়াছে । আমরা কেবল অতিথিসেবার অনুরোধে তাহাকে ঘরের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়া দিয়াছি । এখন, যাহা আদেশ হয় করুন ।

সন্ন্যাসী বলিলেন,—এ-ও কি একটা কথা ? না দেখিলে একথা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না । আচ্ছা, মড়াছেলে—মড়াছেলেই কই ঘরের ভিতর হইতে লইয়া আইস দেখি ?

দীনবন্ধুদাস কি করেন, সন্ন্যাসীর আদেশে তখনই স্ত্রী-পুরুষে বাইরা ঘরের ভিতর হইতে সেই মাছর-জড়ানো মড়াছেলেকে

লইয়া আসিলেন এবং মাহুরখানি খুলিয়া সন্ন্যাসীর সম্মুখে স্থাপন করিলেন । দেখিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন,—ওহে দীনবন্ধুদাস, তোমাকে ‘জ্ঞানবন্ত’ বলে কে ? আমিতো দেখিতেছি, তুমি বড় মন্দলোক । তুমি কিনা—

“মমা পুত্রকু গৃহে থোই । বসিচ্ছু মাচ্ছ-ভাত খাই ॥”  
মড়াছুলেগেটকে ঘরের ভিতর পুরিয়া রাখিয়া মাহুভাত খাইতে বসিয়া গেছ ? আরে ছি ছি !

দীনবন্ধুদাস বলিলেন,—গোঁসাই, তোমায় আর আমি বেশী কি-ই বা বলিব । তবে একটা কথা বলি,—

“কে অটে কাহার কুমর । কে অটে কাহার পিতর ॥  
যেসনে চূতবৃক্ষ খাই । তাই বউল বউলই ॥  
কেতেহেঁ কশিকু ঝড়ই । কেতে বা বড়িণ পড়ই ॥  
কেতে পাচিলা যাএ ডালে । খাইন পড়ে বৃক্ষতলে ॥  
এমন্তে কেতে ঝড়ি যাই । তা তুলে বৃক্ষ নিকি ধাই ॥  
এহি প্রকারে এ সংসার । বৃক্ষর ফলর প্রকার ॥  
তাহার স্মৃথে সে ঝড়িলা । মোর অতিথিসেবা হেলা ॥”

ঠাকুর, বলুন দেখি, এ সংসারে কে-ই বা কাহার পুত্র, আর কে-ই বা কাহার পিতা ? যেমন আম্রবৃক্ষ । তাহাতে মুকুল হইতেছে । ছোটছোট কসি আম ধরিতেছে । সেই অবস্থাতেই কতক ঝরিয়া পড়িতেছে । কতক বা কিছু বড় হইয়া পড়িয়া যাইতেছে । আবার কতক-কতক গাছের ডালেই পাকিয়া গিয়া সেই গাছের তলে পতিত হইতেছে । ছোট হউক, বড় হউক, আর মাঝারীই হউক, বৃক্ষ হইতেই ফলগুলি ঝরিয়া-ঝরিয়া পড়ে ।

তাই বলিয়া কি বৃক্ষ সেই ফলের সঙ্গে-সঙ্গে ছুটিয়া যায় ? এ সংসারও এই প্রকার । শিশু হউক, যুবা হউক, আর বৃদ্ধই হউক, কাল পূর্ণ হইলে ফলের মত সকলেই ঝরিয়া পড়ে । যে ঝরিয়া পড়িবার পড়িরা গেল, তাহার পাছুপাছু ছুটিবার কোন আবশ্যক আছে কি ? আমার পুত্রের কাল পূর্ণ হইয়াছিল— ঝরিয়া পড়িবার উপযুক্ত সময় আসিয়া গিয়াছিল, তাই সে আপনার স্থখে আপনি ঝরিয়া পড়িয়াছে । তাহার জন্ত কাতর হইলে,—চিন্তাম্রোত তাহার দিকে প্রধাবিত করিয়া রাখিলে আমার চলিবে কেন ? না, তাহা রাখা উচিত ? তাহাতে কিছু লাভ আছে কি ? আমার যে অতিথিসেবা হইল, ইহাই পরম লাভ । ইহার অপেক্ষা অধিক ভাগ্যই বা কি হইতে পারে ?

দীনবন্ধুদাসের কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী হাস্য করিতে লাগিলেন এবং দীনবন্ধুর পত্নীর প্রতি বলিলেন,—ওঃ তোমার কি কঠিন প্রাণ । তোমার শরীরে একটুকুও দয়ামায়া নাই । তুমি হইলে ছেলের মা ; আর তুমি কিনা—

“মমার পুত্রকু পকাই । বসিছু মাচ্ছ-ভাত খাই ॥”

মড়া ছেলেকে ফেলিয়া রাখিয়া নাচ্ছ-ভাত খাইতে বসিয়া গিয়াছ ? ছিছি, বড় লজ্জার কথা লজ্জার কথা ।

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া তিনি দীর্ঘশ্বাসে বলিতে লাগিলেন,—

“স্বরূপ শুন হে গোসাই । যুঁ কে মো পুত্র কে অটাই ॥

যেসনে চক্রী চকুখণ্ড । মৃত্তিকা যদি গড়ে ভাও ॥

কে গড়ু গড় ভাঙ্গি যাই । কেহ পোড়িবা যাএ খাই ॥

যেমন ভাঙ ভাঙ্গি যাই । তা তুলে চক্রী নিকি ধাই ॥  
সে চক্রীভাঙ মুহি শুন । এ সৰ্ব গোবিন্দ-ভিত্তি ॥”

গোঁসাই হে, আমি তোমাকে অন্তরের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর ।  
আমিই বা কে, আর আমার পুত্রই বা কে ? আমাদের পরস্পর  
কিসেরই বা সম্বন্ধ ? যেমন চক্রী ( কুম্ভকার ) চক্রখণ্ডের উপর  
মৃত্তিকা চাপাইয়া ভাঁড় গড়িয়া থাকে । গড়িবার সময় কতক ভাঁড়  
গড়িতেগড়িতেই ভাঙ্গিয়া যায় । কতক আবার পাঁজা মাজাইয়া  
পোড়াইবার সময় ভগ্ন হইয়া যায় । যে ভাঁড় ভাঙ্গিয়া যাইবার সে  
ভাঙ্গিয়া গেল, তাই বলিয়া কি কুম্ভকার সেই ভাঁড়ের সঙ্গেসঙ্গে  
কখনও ছুটাছুটি চলিয়া যায় ? ঠাকুর গো, সেই কুম্ভকারের ভাঙের  
মত আমাদের পরস্পর সম্বন্ধ । কেহই কাহারও জন্ত মরে না । প্রকৃত-  
পক্ষে কাহারও সহিত কাহারও কোন সম্বন্ধই নাই । তবে কিনা,  
এ সকল সেই লীলাময় শ্রীগোবিন্দেরই লীলাখেলা ;—এ সংসার  
কিংবা এখানকার কৃত্রিম সম্বন্ধ বাহা কিছু সমস্ত তাঁহারই রচনা ।

তাঁহার কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী পরম পরিতোষ লাভ করিলেন ।  
তখন তিনি দীনবন্ধুদাসের অপর পুত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,  
ওহে বাপু, তোমার এ কিরূপ আচরণ ? তোমার দাদা মরিয়া  
গিয়েছেন না ? আর তুমি কি না—

“মৃত্যুশব্দ তু পকাই । বসিছু মাছ-ভাত খাই ॥”

মড়া ভাইকে ফেলিয়া রাখিয়া মাছ-ভাত খাইতে বসিয়া গিয়াছ ?  
ছিছি, বড় লজ্জা বড় লজ্জা ! তোমার মত অজ্ঞান ত আর দেখা  
যায় না ।

এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণকুমার বিমল-সহকারে বলিয়া উঠিলেন,—

“শুন হে সন্ন্যাস গোসাই । সে মোর কেতে জন্মে ভাই ॥  
 মূঁ তার কেমন্ত সোদর । এ সৰ্ব্ব মায়া'র সংসার ॥  
 যেসনে হাটে বণিজার । পসরা বসই অপার ॥  
 একই ভ্রাত প্রারে হোই । বসিগ বিকু থান্তি তহি ॥  
 ঘাপার সরই যাহার । সে বান্ধি চলে তার পুর ॥  
 যাহার সরিগ ন থাই । সে নিকি তার সঙ্গে বাই ॥  
 সেই প্রকারে এ সংসার । তাহার মোহর ব্যাপার ॥  
 ব্যাপার সরিলা সে গলা । মোর অতিথিসেবা হেলা ॥”

সন্ন্যাস-গোসাই, আমার কথা শুনুন । যাহাকে আমার ‘অগ্রজ’ বলিতেছেন, তিনি আমার কত জন্মের বড় ভাই, আমিই বা তাঁহার কত জন্মের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ? কেহই কাহারও নয় । সারা সংসারটাই মায়া'র খেলা । সংসার ত নয়, যেন একটা প্রকাণ্ড হাট । হাটে যেমন নানা দেশের ব্যাপারীরা পাশাপাশী পসোরা সাজাইয়া বেচা-কেনা করিতে বসিয়া যায় ; তাহাদের পরস্পর কোনকালে কোনরূপ আলাপ-পরিচয় না থাকিলেও, জাতিগত বা ব্যবহারগত ঐক্য না থাকিলেও, যেমন এক-মায়ে'র সন্তানের মত তাহারা গা-ঘেঁসাঘেঁসি বসিয়া ব্যাপার করিতে থাকে । অথচ ব্যাপার শেষ হইয়া গেলে, কেহ কাহারও খোঁজ খবর না রাখিয়া, যে যাহার বোচকাবুচকি বা পৌঁটলা-পুঁটলি বাঁধিয়া আপন আপন গৃহ অভিমুখে চলিয়া যায়, এ সংসার-হাটের ধরণটাও সেই প্রকার । এ হাটের বেচা-কেনা হইয়া গেলে আর থাকিবার যো নাই । দাদার ব্যাপার শেষ হইয়া গেলে, তিনি চলিয়া গেলেন । আমার ব্যাপার এখনও শেষ হয় নাই,

সুতরাং থাকিতেই হইবে । ঠাকুর গো, এ হাটে যাহার ব্যাপার শেষ হয় নাই, সে কি কখনও ব্যাপার শেষ করিয়া ঘরমুখো ব্যাপারীর পাছুপাছু ছুটিয়া চলে ? আমার যে অতিথিসেবা হইল, ইহাই পরম লাভ ।

ব্রাহ্মণকুমারের কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী মনেমনে মহা আনন্দ অনুভব করিলেন । মনেমনেই তাহার বুদ্ধির শতমুখে প্রশংসা করিতে লাগিলেন । তাহার পর দীনবন্ধুদাসের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূকে ডাকিয়া বলিলেন,—ওগো বাছা, তোনারই বা আচার-ব্যবহার কি প্রকার ? তোনার স্বামী মরিয়া গেলেন, তুমি বিধবা হইলে ; তুমি কোথায় বিধবার মত আচার-ব্যবহার করিবে । না, তুমি—

“মৃত্যু পিণ্ডকু ঘরে ধোই । আনিষ ভুঞ্জি লোড়ু তুহি ॥”

সেই মৃত পতিকে ঘরে রাখিয়া আমিষ ভোজনের জন্ত লালসিত হইয়াছ ? ছি ছি, তোনার জ্ঞানি-পণায় ষিক্ ষিক্—শত ষিক্ !

সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া বিধবা বলিয়া উঠিলেন,—প্রভু, আমার একটা কথা শ্রবণ করুন,—

“কেছ অটাই কাহা ভর্তা । কে পুনি কাহার বণিতা ।

বেসনে ঘোর বৃষ্টিকালে । নদী পূরণ বহে জলে ॥

বনস্ত-কাঠখণ্ড দুই । মিশিন ভাসি যাউ-খাই ॥

কেতেহেঁ দূরে ভাসি যান্তে । লতায়ৈ উহাড়ন্তি পথে ॥

তহু গোটিএ লাগি রহি । আরেক ষণ্ডি ভাসি যাই ॥

যেদন কাঠ ভাসি যাই । আরেক কাঠ কি গোড়াই ॥

সেহি প্রকারে এ সংসার । গোবিন্দ-লীলা-খেলেঘর ॥

বিনা দ্বাশ্রিতে সেহি গলা । মোর অতিথিসেবা হেলা ॥”



কে কাহার পতি, কে-ই বা কাহার পত্নী ? যেমন প্রবল বর্ষাকালে নদীর জল কাণেকাণ হইয়া তরতর বেগে বহিয়া চলিয়াছে । সেই খরতর স্রোতে দুইখানি বনের কাঠ মিলিয়া-মিলিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে । কিছুদূর ভাসিয়া যাইতেযাইতে হঠাৎ পথিমধ্যে নদীতীরের লতা আসিয়া কাঠ দুইখানিকে জড়াইয়া ধরিল । দুইখানির একখানি কাঠ সেই লতার বন্ধনে বাঁধা পড়িয়া গেল, আর একখানি কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া ভাসিয়া চলিয়া গেল । ঠাকুর গো, এ সংসারের মেলামেশাও সেই প্রকার, আর ছাড়াছাড়িও সেই প্রকার । নদীবেগে যে কাঠখানি ভাসিয়া চলিয়া গেল, লতাবিতানে আবদ্ধ কাঠখানি কি কখনও তাহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ দৌড় দিতে থাকে ? যে আশ্রয় পাইল, সে থাকিয়া গেল, আর যে পাইল না, সে চলিয়া গেল । তাহাতে কাহারও কিছু আসে যায় না । এ সংসার সেই লীলাময় শ্রীগোবিন্দের খেলাঘর । তিনি এই খেলাঘরে যে কত খেলা—কত মিলন-বিচ্ছেদের খেলা—কত হাঁসি-কান্নার খেলা—কত ভাঙ্গাগড়ার খেলা প্রতিনিয়ত খেলিতেছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নিরূপণ করা যায় না । আমার পতি আশ্রয় পাইলেন না, তাই কালের স্রোতে কোন্ অলক্ষ্য প্রদেশে তিনি ভাসিয়া চলিয়া গেলেন । অাম যে কর্ম্মসূত্রে বাঁধা পড়িয়া আছি । আমার তো আর কোথাও ঘাইবার যো নাই । এ অবস্থায় আমার যে অতিথিসেবা হইল, ইহাই পরম লাভ ।

সন্ন্যাসী এই কথা শুনিয়া মনেমনে বলিলেন,—“অহো ! এ চারিজনেরই মন ধনু ! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এ চারিজনের মত তো কেই

আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারাই ইহাদের তুলনা।”  
এইরূপ সাধুবাদ দিয়া সন্ন্যাসী তাঁহার কনগুনু হইতে কিঞ্চিৎ  
জল ও তুলসী লইয়া সেই মৃতের মুখে সিঞ্চন করিলেন এবং  
জলদগন্তীর স্বরে বলিতে লাগিলেন,—ওহে বিপ্রকুমার, গাত্রোথান  
কর—গাত্রোথান কর ।

সন্ন্যাসীর কথা শেষ হইতে-না-হইতে সেই মৃত শরীরে জীবনী-  
শক্তি আবার আসিয়া দেখা দিল। বিপ্রকুমার যেন নিদ্রা হইতে  
উঠিয়া উপবেশন করিলেন এবং সম্মুখে সেই অপূর্ব সন্ন্যাসিমূর্তি  
দেখিয়া তাঁহার চরণভলে লুটাইয়া পড়িলেন ।

সন্ন্যাসীর প্রভাব দেখিয়া সকলে মহা বিস্মিত হইলেন। কিন্তু  
অহো কি ভাগবতী মায়া, তখনও কেহ সে সন্ন্যাসীকে চিনিতে  
পারিলেন না ;—এ সন্ন্যাসী সহস্র সন্ন্যাসী নন। ষাটার জন্ত শত  
সহস্র লোকে বিষয়-বৈভব আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী  
হইয়া থাকেন, ইনি সেই সকল সন্ন্যাসীর মূল সন্ন্যাসী—সন্ন্যাসী  
করার গুরু সন্ন্যাসী ! সকলে যেন কোন্ ষাট্ময়ে অভিভূত হইয়া  
সন্ন্যাসীর সেই কমনীর মুখের দিকে অদাক্ হইয়া তাকাইয়া  
রহিলেন ; আর তাঁহাদের পলকহীন নয়ন হইতে দরদর ধারে  
আনন্দের ধারা ধরায় বরিয়া পড়িতে লাগিল। সকলেরই মনে  
কেবল একই প্রশ্ন,—এ সন্ন্যাসী ঠাকুর কে ?

সন্ন্যাসীও সহাস্তবদনে তৎকালজীবিত ব্রাহ্মণ-কুমারকে বলিতে  
লাগিলেন,—

“প্রভু বোইলে—আরে মৃত । মূঁ ত দেখিনি বিপরীত ॥

দেখ তো জননী পিয়র ।	আবর পত্নী সহোদর ॥
তোর অর্জনে করি আশ ।	খাটণ খাস্তি তোর পাশ ॥
এবে তো মৃত্যুকাল দেখি ।	গুপত করি তোতে রখি ॥
বসিলে মাছ-ভাত খাই ।	কেহে এহাঙ্ক ঘরে তুহি ॥
হোইণ অচ্ছ রে নন্দন ।	ধিক এ তোহর জীবন ॥”

ওহে বিপ্রকুমার, আমি তো বড়ই বিপরীত দেখিতেছি । দেখ, তোমার মাতা পিতা বনিতা ও ভ্রাতা সকলে তোমার উপার্জনের আশা করিয়াই তোমার জন্ত খাটাখাটুনি করিত । কিন্তু আজ তোমার মৃত্যু হইয়াছে দেখিয়া সকলে তোমাকে ঘরের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া মাছ-ভাত খাইতে বসিয়া গিয়াছে । হায় হায় ! তুমি এমনতর লোকের ঘরে ছেলে হ'য়ে আসিরাছ কেন ? তোমার জীবনে ধিক—জীবনে ধিক ।

সন্ন্যাসিগোস্বামীর কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণকুমার বলিয়া উঠিলেন,—

“কে কার জননী পিয়র ।	কে কার ভ্রাত সহোদর ॥
কে কার অটই যুবতী ।	কে পুনি অটে কাহা পতি ॥
মিথ্যা অটই এ সংসার ।	কেহি ত নুহই কাহার ॥
যেসনে ঘোর গ্রীষ্মকালে ।	পথরে পথিক সকলে ॥
পাঞ্চ-পঞ্চিশ ষাউ খাস্তি ।	বাটরে বৃক্ষেক দেখন্তি ॥
এক-গৃহর প্রারে হোই ।	বসন্তি তখি-তলে ষাই ॥
শ্রম সরিলে যে-ঝা-মতে ।	চলন্ত বৃক্ষ খাই পথে ॥
সেহি প্রকার এ সংসার ।	ঋণানুবন্ধন বেভার ॥
এথকু শ্রীকৃষ্ণ-ভজম ।	সাধুক সেবা প্রতিদিন ॥
করি বঞ্চই যেউ নর ।	ধন্ত জীবন বোলি তার ॥”

ঠাকুর হে, কে কাহার জননী-পিতা, কে কাহার সহোদর-ভ্রাতা,

কে কাহার যুবতী, আর কে-ই বা কাহার পতি ? এ সংসার মিথ্যা । কেহই তো কাহারও নয় । যেমন দেখিতে পাই,—ঘোর-তর গ্রীষ্মকাল । প্রচণ্ড রৌদ্র । পথে পাঁচ-সাত বিশ-পঁচিশ জন পথিক যাইতেছে । যাইতেযাইতে তাহারা পথের মাঝে বেশ একটি বড় ছায়াবৃক্ষ দেখিতে পাইল । অমনি তাপ জুড়াইবার জন্ত সকলে সেই বৃক্ষের তলে একপরিবারের মত যাইয়া বসবাস করিতে লাগিল । আবার তাপ শান্তি হইলে তাহার যেনিকে ইচ্ছা চলিয়া যাইতে থাকিল । পথের বৃক্ষ পথেই পড়িয়া রহিল । সারা সংসারটাও এই প্রকার । এখানকার ব্যবহারও ঐ ধরনের । গাছের তলে মেলামেশার মত এখানকার মেলামেশা । গাছের তলে ছাড়াছাড়ির মত এখানকারও ছাড়াছাড়ি । তাপ শান্তি পর্য্যন্তই যেমন পথিকের পরস্পর সম্বন্ধ, তেমনই কোন-না-কোন জন্মের ঋণ পরিশোধ পর্য্যন্তই এখানকার পরস্পর সম্বন্ধ । তাপ শান্তি হইয়া গেলে পথিক আর বৃক্ষতলে থাকে না । ঋণ শোধ হইয়া গেলে এখানকারও কেহ এক মুহূর্ত্ত গৃহে অবস্থান করে না । গাছের তলে থাকিবার জন্ম কেহ আসে না, যাইবার জন্মই আসে ; এ সংসারেও সেইরূপ থাকিবার জন্ম কেহই আসে না, যাইবার জন্মই আসে । এখানকার এই অল্প অনিরূপিত অবস্থানকালের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বন ও মাধুসূদনের সেবা করিয়া, জীবনবাণন করিতে পারে, তাহারই জীবন ধন্য ও কৃতার্থ হইয়া যায় । তাহারই এখানে আসা সার্থক ।

কুমারের কথা শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসীর আনন্দ আর ধরে না ।

তিনি মনেমনে বলিলেন,—অহো ! এই পাঁচ জনেরই কি বিগ্ন ভাব । ধন্য ইহারা । ইহাদের হৃদয়ে ধারণ করিয়া ধরণী আজ ধন্য হইলেন ।

এইবার সন্ন্যাসী রাশিরাশি আনন্দের হাঁসি হাসিতেহাসিতে প্রীতিপ্রকম্পিতস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—দীনবন্ধুদাস, বৎস ! তোমাদের পাঁচজনেরই অকপট ব্যবহার, অতিথিসেবার আন্তরিক অনুরাগ এবং ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি দেখিয়া আমি অপরিমিত আনন্দ লাভ করিয়াছি । আজি অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে তোমাদের আশীর্বাদ করি,—

“জীবন্তে সুখী হোই থাঅ । মলে শ্রীহরি-পাদ পাজ ॥”

তোমরা পরম সুখে জীবন যাপন কর এবং অন্তে শ্রীহরির পাদপদ্ম লাভ কর ।

সন্ন্যাসীর এই আশীর্বাদবাণী শ্রবণ করিয়া সকলেই তাঁহার চরণতলে যুগপৎ পতিত হইলেন । সকলেরই প্রাণের কথা—ঐ অভয় পাদপদ্ম-তলে যেন চিরদিনই পড়িয়া থাকি ।

সন্ন্যাসীও সকলের মস্তকে সুকোমল হস্ত অর্পণ করিয়া বরদান করিলেন,—“তোমাদের ভয় দূর হউক, ভয় দূর হউক । এককে ছাড়িয়া দুইএ মজিলেই ভয় দেখা দেয় । তোমরা সেই এক অদ্বিতীয় ভগবানেই অহরহ মজিয়া থাক । এই বিশাল বিরাট দুইএর রাজ্য—ভয়ের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি ‘সংসার’ আর তোমাদিগকে কিছুতেই অভিভূত করিতে পারিবে না । আমার বরে তোমরা অভয় হও—  
অভয় হও ।”

তখন যেন সকলে কোন্ এক নেশার আবেশে আপন-হারা ।  
 সকলের শরীর মন প্রাণ সকলই যেন এলাইয়া পড়িয়াছে । সন্ন্যাসীর  
 চরণপ্রান্ত হইতে কাহারও আর সরিয়া যাইবার সাধও নাই, সাধ্যও  
 নাই । এক অপূর্ব আনন্দ-আলম্বে সকলেই জড় হইয়া গিয়াছেন ।  
 এমন সময় কে যেন তাঁহাদের কাণের কাছে কম-কণ্ঠে কহিয়া  
 উঠিলেন,—“তোমরা তো আমার চিন্তে পারিলে না, আমি  
 চলিলাম ! আমি ধরা দিব বলিয়া আসিয়াছিলাম, তোমরা তো  
 আমার ধরিয়া রাখিতে পারিলে না, আমি চলিলাম । চলিলাম বটে,  
 কিন্তু তোমাদের আপদ-বালাই সকল লইয়া চলিলাম,—তোমাদের  
 ভাব-মূল্যে কেনা হইয়াই চলিলাম । আমি চিরদিন তোমাদের  
 হৃদয়ে-হৃদয়ে জাগাইয়া রাখিব । দেখো তোমরা যেন আমার ভুলিও  
 না । তোমরা আমার, আর আমি তোমাদেরই, এ কথা সর্বদা মনে  
 রাখিও । তবে আমি যাই । তোমাদের ছাড়িয়া যাইতেও প্রাণ যেন  
 কাঁদিয়া-কাঁদিয়া উঠিতেছে । কিন্তু কি করি, আমার যাইতেই হইবে ।  
 আমার যে নানান কষ্ট । তাই আমি চলিলাম, তোমরা কিছু  
 মনে করিও না । তবে যাইবার সময় আমার পরিচয়টাও তোমাদের  
 দিয়া যাই । আমি কে জান ?—আমি সেই জগজ্জীবন ভগবান্ ।”

ভগবানের ভুবন-ভুলনো ভাষায় সকলে চমকভাঙ্গা হইয়া চাহিয়া  
 দেখেন,—সেই দিব্য জ্যোতির্ময় সন্ন্যাসিমূর্তি অস্তহিত হইয়াছেন ।  
 যাহা পাইবার তাহা পাইয়াছি, ভাবিয়া সকলের যে আনন্দ-আবেশ-  
 টুকু আসিয়াছিল, এইবার তাহা একেবারেই ভাঙ্গিয়া গেল । সকলে  
 তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন,—চারিদিকেই ছুটাছুটি খোঁজাখুঁজি

আরম্ভ করিয়া দিলেন ; কিন্তু হায়, কোথায় বা সন্ন্যাসী—আর কোথায় বা ভগবান্ !

তখন পাঁচজনেই কাঁদিতে-কাঁদিতে তাঁহার উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন,—ঠাকুর হে, তোমাকে দয়ালু বলে কে ? তোমার মত নিষ্ঠুর-হৃদয় তো আর দেখা যায় না । যদি দিবারই বাসনা নাই, তবে নিবি দেখাইবার কি আবশ্যক ছিল । আবার সেই নিবি হরিয়া লইয়াই বা কি পৌরুষ প্রকাশ করিলে ? একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতেও তো দিলে না । পিছু ফিরিয়া চাহিয়া দেখিতে-না-দোখিতে সে নিবি হরণ করিয়া ফেলিলে । তুমি মায়া-বীর অগ্রগণ্য । ব্রহ্মা-আদি দেবগণও যখন তোমার মায়ায় মুগ্ধ—তোমার মায়ায় খেলা বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, তখন কীটাকীট আমরা কোথায় লাগি । তুমি সর্বশক্তিমান, তোমাকে আর অধিক কি-বলিব । তুমি আমাদের ভাগবান্‌র মোহনমন্ত্র শুনাইয়া যে রূপা প্রকাশ করিয়াছ, আমরা যেন সেই রূপাকণিকাটুকু চিরদিন উপভোগ করিতে পারি,—ধ্রুবনক্ষত্রের মত সেই রূপার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভীষণ ভবসাগরের পারে গমন করিতে পারি ।

ভগবানের আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হইবার নহে । তাঁহার বরে ব্রাহ্মণ-পরিবার অতিথিসেবা, সাধুসঙ্গ ও হরিভজন করিয়া পরমানন্দে দিন যাপন করিতে লাগিলেন এবং দেহান্তে সকলেই সেই শ্রীহরির অভয়পদ লাভ করিলেন ।

আমরা আর এবার তক্ত বা ভগবান্ কাহারও জয় ঘোষণা করিব না । এবার জয় ঘোষণা করিব—গার্হস্থ্য আশ্রমের । এই

আশ্রমেই না এই অমৃতোপম অতিথিসেবার ব্যবস্থা । এই অতিথি-  
 সেবাই না ভগবানকে কোন্ অপ্রাকৃত ধাম হইতে অতিথির বেশে  
 আকর্ষণ করিয়া আনিল । ভাই গৃহী, তোমার আশ্রমে যখন অতিথি-  
 সেবা রহিয়াছে, তখন তোমার ভয়ই বা কি, আর ভাবনাই বা কি ?  
 তুমি শ্রীহরির প্রীতিকামনার অতিথির কামনা পূর্ণ করিও । ক্ষমতার  
 না কুসাইলে, দুইটা মিষ্ট কথা বলিয়াও তাঁহাদের সন্তোষ সম্পাদন  
 করিও, দেখিবে—নিশ্চয় দেখিবে, দীনবন্ধুদাসের মত তোমার দ্বারেও  
 একদিন অনাথনাথ অতিথিবেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন ।

---



## বিশ্বম্ভর দাস ।

উড়িষ্যাদেশে ঢেঙ্কানাঙ্গ অতি প্রসিদ্ধ স্থান । বিশ্বম্ভর দাস সেই স্থানেই বাস করিতেন । তিনি করণ জাতি—এক রকম বেণিয়া । পরিবারদর্গ বড় বেশী নয়—এক স্ত্রী ও একটি পুত্র লইরাই তাঁহার ঘরকরনা । বিশ্বম্ভর ভারি ভগবদ্ভক্ত । তাঁহার পত্নী বেবতী যার-পর-নাই পতিপরায়ণা । পুত্র রঘুনাথও পিতার সতত আজ্ঞানুবর্তী । তিনটী প্রাণী যেন একটি সুরে বাঁধা তিনটা যন্ত্র । একের হৃদয়তন্ত্রীতে যে স্বর বাজিয়া উঠে, আর দুইটার হৃদয়তন্ত্রীতে তাহার ঝঙ্কার আপনা-আপনিই হইতে থাকে । তিনজনেরই নতিগতি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-পাদপয়ে । তিনজনেই নিত্য শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করেন । তিনজনেই অহরহ শ্রীনামভজনে মাতিয়া রহেন । যদি কেহ তাঁহাদের কাছে নামমহিমা কীর্তন করেন, তাঁহারা আর তাঁহাকে ছাড়িতে চান না । যাইতে চাহিলেও ‘আর একটু বসুন,—আর একটু বসুন’ বলিয়া যাইতে দেন না । যাহার মুখে একটি ‘নাম’ সুনিতে পান, তাঁহাকেই গুরুর মত মান্য করিয়া থাকেন । নামে তাঁহাদের এতই শ্রদ্ধা এতই প্রীতি ।

বিশ্বম্ভরদাস সামান্য গৃহস্থ লোক । অবস্থা তত ভাল নয় । কিন্তু তাঁহার দ্বারে ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব যোগি-সন্ন্যাসী অতিথি-অভ্যাগত যতই আসুন, তিনি একটুও বিরক্ত হইতেন না । যথাসাধ্য যত্ন-সহকারে সকলেরই সংকার করিতেন । কাহাকে অন্ন দিয়া কাহাকে

বা বস্ত্র দিয়া তাহার উপর বিনয়-বচন বলিয়া সকলকেই সম্মানিত ও সম্বৃত্ত করিতেন। তবু মিরালমুচক 'না' কথাটি মুখ ফুটিয়া কাহাকেও বলিতে পারিতেন না।

বিশ্বম্ভরদাস বড় দাতা, এ কথা তখন মুখেমুখে ধ্বনিত হইতে লাগিল। কথায়-কথায় বিশ্বম্ভরদাসের কথা উঠিলে 'ধন্য ধন্য' রবের ধুম পড়িয়া যাইতে লাগিল। দেখিতেদেখিতে বিশ্বম্ভরের যশে বিশ্ব-সংসার ছাইয়া ফেলিল।

দৈবের খেলা বুঝা ভার। এ সংসারের আমি তুমি এ ও সে—সকলেই সেই দৈবের খেলার সামগ্রী। তিনি কখন কাহাকে লইয়া কিসের জন্ত যে কি খেলা খেলেন, কিছুই বুঝা যায় না। তোমাকে লইয়া খেলা আরম্ভ হইলে আমি তোমার খেলা দেখি, হাসির খেলা হয়তো হাসি, কান্নার খেলা হয়তো কান্না, আর হাসি-কান্নার অতীত অজ্ঞ কোন খেলা হইলে বিশ্বয়-বিমুগ্ধনেত্রে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকি। তোমার বেলায় যেমন আমি দেখি, আমার বেলায় তেমনি তুমিও দেখ। কিন্তু “কে খেলায়, আমি খেলি বা কেন”—এ রহস্যের উদ্ভেদ করিতে আমরা কেহই পারি না।

এ সংসারে আসিয়া দৈবের এ খেলার আবর্তে পড়ে না কে? একদিন-না-একদিন সকলকেই পড়িতে হয়। তাই আজ ভক্ত বিশ্বম্ভরদাসকেও সেই খেলার আমলে আসিতে হইয়াছে। এ খেলাটা কিরূপে আরম্ভ হইল,—বলিতেছি।

ভগবানের প্রাণের অপেক্ষা প্রিয়তম পরম ভাগবতগণ কখন এক স্থানে অবস্থান করেন না। তাঁহারা তীর্থযাত্রার ছাড়া ধরিয়া দেশেদেশে

ধুরিরা বেড়ান । একবার যাঁহার নাম করিলে মহা মহা অপবিত্রও পবিত্র হইয়া যায়, সেই ভগবান্কে যাঁহারা হৃদয়ের মধ্যে চির অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের তো আর নিজেকে পবিত্র করিবার জন্ত তীর্থযাত্রা নয় ; জীব-উদ্ধারের জন্তই তাঁহাদের এই তীর্থযাত্রা । তাঁহারা এক স্থানে বসিয়া থাকিলে তো আর জগতের পাপী তাপী জীবের গতি কিছু হইয়া উঠিত না, তাই তাঁহারা তাঁহাদের হৃদ্বিহারী হরির প্রেরণাতেই হউক, আর তাঁহাদের অপরিমিত দয়ার প্রেরণাতেই হউক, তীর্থযাত্রার ব্যপদেশে নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন । ইহাতে তাঁহাদের এক কাজে দুই কাজই হয় । এক দিকে তাঁহারা ভিখারীর ভঙ্গীতে গৃহীর গৃহে গমন করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিয়া আসেন ; অপরদিকে অশিশ্রান্ত পাপীর পাপ লইয়া-লইয়া তীর্থেরও যে মলিনতা আসিয়া যায়, সে মলিনতাও নাশ করিয়া আসেন ।

যাঁহারা হৃদয়ের মধ্যে হরিকে পুরিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা না পারেন কি ? হরি তাঁহাদের হাত-ধরা । তাঁহাদের হরি তাঁহারা যাকে-ইচ্ছা তাকেই দিতে পারেন । শ্রদ্ধাদত্ত একমুষ্টি অন্ন বা দুইটি স্নমিষ্ট কথার বিনিময়ে তাঁহারা সামান্য ধনরত্ন কি—অমূল্য ও অতি দুর্লভ তাঁহাদের প্রাণের হরিকেও অকাতরে দান করিয়া আসেন । গৃহীর দানের প্রতিদানে দয়ার প্রস্রবণ ভাগবতগণের আর বুদ্ধি মনে থাকে না,—আমরা আমাদের হৃদয়সর্বস্ব দান করিয়া ফেলিতেছি । পার্থিব পদার্থের মত হরির নাকি ক্ষয় নাই, নাশ নাই, তাই এত দিলেও সাধুর হৃদয় হইতে হরি আর ফুরাইয়া যান

না । হরি আমার এ জগতের সামগ্রী হইলে পরম দয়াল ভক্তের হাতে পড়িয়া কবে যে ফুরাইয়া যাইতেন, তাহা আর বলা যায় না ।

সে যাহা হউক, একদিন এইরূপ একদল তৈথিক সন্ন্যাসী দেশেদেশে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেবেড়াইতে বিশ্বম্ভরদাসের দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তাঁহাদিগকে যে দেখে, সে-ই বলে, এই গ্রামে বিশ্বম্ভরদাসের বাড়ী ; আপনারা তাঁহার গৃহে গমন করুন, তিনি অবশ্য ভোজন দানে আপনাদিগকে আনন্দিত করিবেন ।

সাধুগণ এই প্রকার একই কথা শুনিতেশুনিতে,—তাঁহাদিগেরই প্রদর্শিত পথে চলিতেচলিতে বিশ্বম্ভরদাসের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তখন বেলা আর নাই । সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে । সাধুবৃন্দ দ্বারে রহিয়াই উচ্চস্বরে আহ্বান করিলেন,— বিশ্বম্ভর, ওহে ও বিশ্বম্ভর ! একবার এদিকে এস ত ।

অতিথিসেবার যাহাদের নিষ্ঠা আছে, তাঁহাদিগের কর্ণধর অতিথির কর্ণধর শুনিবার জন্ত সর্বদাই সতর্ক থাকে । সাধুগণের প্রার্থনাবাগী মুখ হইতে সম্পূর্ণ বাহির হইতে-না-হইতে বিশ্বম্ভরদাস শশবাস্তে তাঁহাদিগের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ভুবন-পাবন সন্ন্যাসিগণকে দেখিয়া চম্ব্চকু সার্থক করিয়া লইলেন । পরে সকলের পদতলে পতিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন । উঠিয়া— হাত দুইটি যোড় করিয়া কপালে রাখিয়া বিনয় সহকারে বলিলেন,— অহো ভাগ্য অহো ভাগ্য, আজ আমি ধন্য হইলাম, ধন্য হইলাম, ঠাকুর, এখন কি করিতে হইবে, আদেশ করুন ।

তাঁহারা বলিলেন,—বাবা বিশ্বম্ভর, আমরা তোমার বড় ধন

শুনিয়াই আসিয়াছি । আমরা অতিশয় ক্ষুধার্ত । শীঘ্র আহাের আয়োজন করিয়া যাও ।—হাণ্ডী-কাঠ, চাল-দাল, দুধ-দহি, ঘৃত-নবাত, তরি-তরকারি প্রভৃতি লইয়া আইস ; যাও, আর বিলম্ব করিও না, আমাদিগকে ক্ষুধার অন্ন দান করিয়া অপরিমিত পুণ্য সঞ্চয় কর ।

বিশ্বম্ভর 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বাটীর ভিতর গমন করিলেন, স্ত্রী-পুত্রকে সকল কথা বলিলেন এবং সকলে মিলিয়া অতিথি-সেবার সামগ্রীসমূহ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । সকল সামগ্রীই সংগ্রহ হইল, হইল না কেবল ঘৃত । তাহাই তাঁহারা সাধুবৃন্দের সম্মুখে আনিয়া ধরিয়া দিলেন এবং কৃতান্তনিপুটে কহিলেন,—ঠাকুর, আপনাদের আদিষ্ট সকল সামগ্রীই আনিয়াছি, কেবল ঘৃত সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি নাই ।

উত্তরে সাধুগণ বলিলেন,—ঘৃতহীন ভোজন ভোজনই নয় । বিশেষত আমরা ঘৃতহীন অন্ন ভগবান্কে অর্পণ করিব কি প্রকারে ? তা বাপু তোমার সামগ্রী তুমি ফিরাইয়া লইয়া যাও, ইহা আমাদের কোন প্রয়োজনেই আসিবে না ।

এই কথা শুনিয়া বিশ্বম্ভরের পুত্র রঘুনাথ অনেক অমুনয়-দিনয় করিয়া তাঁহাদের চরণতলে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন,—প্রভু, আমাদের অপরাধ লইবেন না, কৃপা করিয়া রক্ষন আরম্ভ করিয়া দিউন, দীন-বন্ধুর কৃপায় রাখিতে রাখিতেই ঘৃত আসিয়া যাইবে এখন । তজ্জন্ত কোন চিন্তা নাই । রঘুনাথের কথায় অতিথিগণও আনন্দ-সহকারে রক্ষন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন ।

এদিকে পিতা-পুত্র ঘরে আসিয়া স্নান-পরামর্শ করিতে লাগিলেন,—এই রাত্ৰিকালে ঘৃত পাওয়া যায় কোথায় ? ঘৃত না পাইলেও বিষম বিপদ ;—অতিথি নিরাশ হইয়া যাইবেন । জীবন থাকিতে অতিথিই যদি নিরাশ হইয়া যাইলেন, তবে আর সে জীবনে ফল কি ? অতিথি বিমুখ হইয়া গেলে ইহলোকে অপমান, পরলোকেও অনন্ত নরক । এখন করা যায় কি ? ভাল, একবার এখানে-ওখানে তন্মাস করিয়াই দেখা যাউক, তাহার পর অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে ।

পিতা-পুত্রে পাতিপাতি করিয়া সন্ধ্যা গ্রাম অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু ঘৃত কোথাও মিলিল না । উভয়েই বিষণ্ণ-মনে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন । চিন্তা যেন শতশত বৃশ্চিকের মত তাঁহাদের দংশন করিতে লাগিল । তাঁহারা যেন জ্ঞানহারা হইয়া পড়িলেন । হঠাৎ বিশ্বম্ভরনাস বলিয়া উঠিলেন,—বৎস, শুনিয়াছি শাস্ত্রে বলে—পরের উপকার কিংবা সাধুসেবার জন্ত যদি কেহ মিথ্যা কথা বলে, অথবা চুরি করে, তাহা হইলে তাহাতে তাহার কোন দোষ হয় না । আমরা যখন এত খুঁজিয়াপাতিয়াও ঘৃত সংগ্রহ করিতে পারিলাম না, তখন সাধুসেবার অনুরোধে চুরি করিতেই বা ক্ষতি কি ? দেখিতেদেখিতে রাত্ৰিও অধিক হইয়া যাইতেছে । এখন ইহা ছাড়া অন্য উপায়ই বা কি আছে ?

পিতার কথায় পুত্রেরও মত হইল । কোন ভাগ্যবানের ভবন হইতে ঘৃত অপহরণ করিয়া আনাই হির হইয়া গেল । পিতা-পুত্রে একখানি শাণিত অস্ত্র এবং একটি সাবল (খস্তা) লইয়া গোবিন্দ স্মরণ করিতে-করিতে বাণীর বাহির হইয়া পড়িলেন ।

সাধুসেবার অকপট অনুরাগে তাঁহাদের অন্তর-বাহির অধিকার করিয়া বসিয়াছে, স্তূতবাঃ চুরি করায় যে কেঁসাদ কত, অবশেষে ধরা পড়িয়া গেলে লাঞ্ছনা-গঞ্জনাই বা কত, তাহা আর তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখিলেন না। তাঁহারা এক ভাগ্যবানের গৃহে গিয়া 'সিঁদ' কাটিলেন। পুত্র সিঁদ দিয়া গৃহের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। পিতা বাহিরে থাকিয়া পাহারা দিতে লাগিলেন।

বড় লোকের বাড়ী। ঘরের চারিদিকেই স্তূরস্তূরে ধন-রত্ন। রঘুনাথ বড় বিপদেই পড়িলেন। এঘর ওঘর যে ঘরই দেখেন—সকল ঘরই হীরক-মণি-মাণিক্যে স্বর্ণ-রৌপ্য-অলঙ্কারে পরিপূর্ণ। সাধুসেবার স্তূত-প্রার্থী রঘুনাথের এ সকল লইয়া তো কিছু হইবে না, তাই তিনি বড় ব্যতিব্যস্তেই পড়িয়া গেলেন। যে ধন-রত্ন মণি-মাণিক্য দেখিলে অনেক মুনির মনও উলিয়া যার—লোভ সংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠে, রঘুনাথ সে সকল একবার অঙ্গুলির অগ্রেও স্পর্শ করিলেন না। তিনি অতি বিবলিত্ব সহিতই সে সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল স্তূতভাণ্ডই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এইরূপ খুঁজিতে-খুঁজিতে তিনি যখন একস্থানে কয়েকটি স্তূতভাণ্ড দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহার আর আনন্দের অবধি রহিল না। তিনি তাহার মধ্য হইতে সাধুসেবার আবশ্যকমত দুইটি ভাণ্ড দুই হস্তে লইলেন এবং সিঁদের গর্ভ দিয়া গলাইয়া পিতাকে প্রদান করিলেন। নিজেও সিঁদের ভিতর দিয়া বাহির হইতে লাগিলেন। স্তূত-ভাণ্ড পাইয়া পিতা বিশ্বস্তুরও আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িলেন।

পিতা-পুত্র যে চুরি করিতে আসিয়াছেন, তাহা যেন ক্ষণতরে বিস্মৃত হইয়া গেলেন। তাঁহাদের আনন্দকলরবে গৃহস্বামী জাগরিত হইয়া উঠিলেন। উঠিয়া দেখেন, সিঁদের ভিতর দিয়া চোর পলাইয়া বাইতেছে। আর যায় কোথা, তিনি বায়ুবেগে আসিয়া রঘুনাথের চরণ চাপিয়া ধরিলেন। ক্রোধে অধীর হইয়া দুই হাতে দুইটি পা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন।

রঘুনাথ দেখিলেন, মহাবিপদ! সিঁদের বাহিরে তাঁহার মুণ্ড, পা দুইটা ঘরের ভিতর, অবশিষ্ট অবয়ব সিঁদের মধ্যে; নিজের ক্ষমতায় আর বাহিরে যাওয়া চলে না। তাই পিতাকে বলিয়া উঠিলেন,—বাবা, সর্বনাশ হইয়াছে, আমি ধরা পড়িয়া গেছি; ভিতর হইতে কে আমার পা দুইটি ধরিয়া ঝাঁকুনি দিতেছে, যদি আপনি পারেন তো আমার মাথা ধরিয়া ঝাঁকুনি দিয়া টানিয়া বাহির করুন, নচেৎ অল্প উপায় নাই।

বিশ্বস্তর কি করেন। পুত্রের কথা শুনিয়া তাঁহার মহা ভয় হইল। তিনি তাঁহার সর্বভয়হারী শ্রীহরিকে প্রাণ ভরিয়া স্মরণ করিতে-করিতে পুত্রের মাথা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন। ভিতরে গৃহস্বামী পা ধরিয়া টানিতেছেন, বাহিরে বিশ্বস্তর মাথা ধরিয়া টানিতেছেন, দুইটানায় পড়িয়া রঘুনাথের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িল। গৃহস্বামী ও বিশ্বস্তর উভয়েই সমান বলবান, সূতরাং যেখানকার রঘুনাথ সেইখানেই থাকিয়া টানাটানির কষ্ট সহ করিতে থাকিলেন। না গৃহস্বামী রঘুনাথকে টানিয়া ঘরের মধ্যে আনিতে পারেন, না বিশ্বস্তর তাহাকে



টানিয়া ঘরের বাহিরে আনিতে পারেন। এইরূপ ধ্বস্তাধ্বস্তি অনেকক্ষণ চলিল। রাত্রিও অধিক হইয়া যাইতে লাগিল। যে সাধুসেবার জন্ত এত কাণ্ড, সেই সাধুসেবাও পণ্ড হইতে চলিল, দেখিয়া রঘুনাথ পিতাকে দৃঢ়তার সহিত বলিয়া উঠিলেন,—

“স্বরূপ শুন আছে তাত ।	এথর সরিলা মহত্ব ॥
রাত্র বহুপি পাহি যিব ।	চিহ্নি সাধুত দণ্ড দেব ॥
সাধুক সেবাহি নোহিব ।	এতেক কষ্ট ব্যর্থ হেব ॥
এথকু বিচার ন কর ।	কাটন নিজ মোর শির ॥
সাধুমানক সেবা হেউ ।	আন্তর মহত্ব ন যাউ ॥
মুণ্ড ন থিলে পিণ্ড এথে ।	চিহ্না ন যিব কদাচিত্তে ॥
এথকু ন কর তু হেল ।	মো মুণ্ড ঘত ঘেনি চল ॥”

কি ভয়ঙ্কর কথা ; শুনিলেও সকল শরীর শিহরিয়া উঠে ! রঘুনাথ বলিতেছেন কি,—“পিতঃ, তুমি আমার মস্তক ছেদন কর। আর বিলম্ব করিও না। ঐ ঐ দেখ, রাত্রি অধিক হইয়া যাইতেছে। গৃহে ক্ষুধার্ত সাধুগণ ঘৃত প্রতীক্ষা করিতেছেন। রাত্রি পোহাইয়া গেলে সকলে আমাকে চিনিয়া ফেলিবে,—আমাদিগের মহত্বও সরিলা যাইবে, দণ্ডও ভোগ করিতে হইবে। অথচ সাধুসেবাও হইবে না। যাহার জন্ত এত কষ্ট, সে কষ্টও ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তাহার অপেক্ষা সাধুসেবাও হউক, সঙ্গে-সঙ্গে আনাদিগের মহত্বও রক্ষা পাউক। দেহে মুণ্ড না থাকিলে, কেবল ধড় দেখিয়া তো কেহ আর চিনিতে পারিবে না। তাই বলি, আর বিলম্বে কাজ নাই, ঐ শাপিত অস্ত্র দিয়া আমার মাথা কাটিয়া ফেল এবং ঘৃতভাণ্ড ও ছিন্নমুণ্ড লইয়া গৃহে চলিয়া

যাও ।” রঘুনাথের কথা শুনিয়া পিতার মাথা যেন ঘুরিয়া গেল । তিনি যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন,—স্নেহে ভয়ে ও শোকে যেন কিঞ্চিৎ কাতর হইয়া পড়িলেন । কিন্তু সাধু-সেবার অনুরাগে তাঁহার সে ভাব তখনই অন্তর্হিত হইল । এদিকে পিতার বিলম্ব দেখিয়া রঘুনাথ অধিকতর উত্তেজনার স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—মায়ায় ভুলিও না পিতা, ঐ তোমার হস্তেই তো শাণিত অস্ত্র রহিয়াছে, তবে আর বিলম্ব কেন, দৃঢ়মুষ্টিতে অস্ত্র ধারণ কর, এক আঘাতে আমার মস্তক দ্বিধা করিয়া ফেল । উদ্দেশ্য ভুলিও না পিতা, উদ্দেশ্য—সাধু-সেবা, সাধু-সেবা, সাধু-সেবা ।

হার অনুরাগ, তুমি এমনি করিয়াই সকলকে অন্ধ কর বটে । হার তুমি কাহাকেও কিছুই দেখিতে দাও না । তুমি কখন যে কাহাকে কাহার টানে ফেলিয়া দাও, বলা যায় না । যাহাকে যাহাতেই ফেলিয়া দাও না কেন, তোমার এমনি অমিত প্রভাব যে, তুমি কেবল সেইটি ছাড়া—যেটিতে ফেলিয়াছ সেইটি ছাড়া; তাহাকে আর সকলই ভুলাইয়া দাও ;—তাহার হিতাহিত বা কর্তব্য অকর্তব্য জ্ঞান পর্য্যন্ত লোপ করিয়া দাও । তোমার পাল্লায় পড়িলে তোমার চোখেই দেখিতে হয়, শুধু দেখা কেন, সকল কার্যই তোমারই মতে করিতে হয়,—তা সে যত বড় কাজই হউক না কেন । এমনি তোমার অপার মহিমা ! তুমি যাহাকে ধনের টানে ফেল, সে ধন ছাড়া আর সকল ভুলিয়া যায় ; অথো পরে কা কথা, সে ভগবান্কে পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায় । ধর্ম্মাধর্ম্ম : কর্ম্মাকর্ম্ম সে কিছুই দেখিতে পার না । দেখে কেবল—টাকা, টাকা আর টাকা । অনুরাগ, তুমি

যাহাকে কামিনীর আকর্ষণে নিক্ষেপ কর, সে-ও সেই কামিনী ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পার না, সে-ও সেই কামিনী ছাড়া মান-অপমান লজ্জা-ভয় প্রভৃতি সকলই ভুলিয়া যার ; তাহারও হিতাহিত বিবেচনা অন্তর্হিত হইয়া যার । সেই কামিনীর জন্ত সে না পারে বা না করে, এমন কার্যই নাই । আজ সেই তুমি যখন বিশ্বম্ভর দাসকেও সাধুসেবার আকর্ষণে ফেলিয়া দিয়াছ, তখন তাহারই বা অসাধ্য কি আছে । গিতা হইয়া আপন হস্তে একমাত্র পুত্রের মস্তক-চ্ছেদন, ইহা কি আর অসম্ভব হইবে ? কখনই না,—কখনই না । ঐ ঐ দেখ, বিশ্বম্ভরদাস দৃঢ়মুষ্টিতে অস্ত্র ধারণ করিল । ঐ ঐ দেখ, অস্ত্র উত্তোলন করিল । ঐ ঐ দেখ, পুত্রের গলদেশে সজোরে আঘাত করিল । ঐ ঐ দেখ, উত্তপ্ত শোণিতের উৎস উথিত হইল । আহা অনুরাগ, ঐ ঐ দেখ, অহো ! আমরা আর দেখিতে পারি না, দেখাইতেও পারি না, কেবল তুমিই দেখ,—ঐ ঐ দেখ, পিতার নিষ্ঠুর অস্ত্র-প্রহারে পুত্রের মস্তক দেহচ্যুত হইল । আরও কিছু দেখিবে কি ? দেখিতে পারো তো দেখ,—ঐ ঐ দেখ, পিতা বিশ্বম্ভর দাস দুই হস্তে দুইটি ঘৃত ভাণ্ড লইয়া—আর কক্ষে বঘুনাথের রক্তাক্ত ছিন্ন মুণ্ড চাপিয়া রাখিয়া চঞ্চলচরণে চলিয়াছে । কোথায় চলিয়াছে জান কি ?—সেই তুমি যাহাদিগের আকর্ষণে তাহাকে ফেলিয়াছ, সেই সাধুদিগের সমীপেই বিশ্বম্ভর চলিয়াছে । অহো, অনুরাগ, ধন্য—ধন্য তোমার মহিমা !!

বিশ্বম্ভরদাসকে লইয়া দৈব বে খেলা জুড়িয়া দিয়াছেন, এতক্রমে তাহা বেশ জমিয়া আসিয়াছে । বিশ্বম্ভরদাস ত্বরিতপদে গৃহে ফিরিয়া

আসিলেন । তাঁহার সাধবী স্ত্রী এতক্ষণ কেবল ঘর-বাহির করিতে-  
ছিলেন । একটু খুট করিয়া শব্দ হইলেও তিনি চকিতনেত্রে চাহিয়া  
দেখিতেছিলেন,—ঐ বৃদ্ধি পতিপুত্র আসিতেছেন । এমন সময়  
বিশ্বম্ভরদাস তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।

একা পতিকে আসিতে দেখিয়া মায়ের প্রাণ উড়িয়া গেল,  
পুত্রের অকল্যাণ আশঙ্কায় তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন, বিশেষত  
স্বামীকে সেই গুরু-গভীর ভাব—সেই ক্রোধবঞ্জিত কলেবর দর্শনে  
তিনি যেন মুহূর্ত্তমান হইয়া পড়িলেন । মনে করিলেন, একবার স্বামীকে  
জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি,—ওগো তুমি যে একা-একাই কিরিয়া আসিলে,  
আমার রঘুনাথ কই ? কিন্তু কে যেন ভিতর হইতে তাঁহার গলা  
চাপিয়া ধরিল, তিনি মুখ ফুটিয়া একটি কথাও কহিতে পারিলেন না ।  
তাঁহার শরীর থরথর কাঁপিতে লাগিল ।

পত্নীর অবস্থা বুঝিয়া বিশ্বম্ভরদাস তাঁহাকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া  
গেলেন । আত্মোপাস্ত সমস্ত কথা তাঁহার কাছে বর্ণনা করি-  
লেন । পুত্রের কঠিত মস্তক কক্ষ হইতে বাহির করিয়া তাঁহার  
হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং উত্তমরূপে লুকাইয়া রাখিতে বলিয়া  
দিলেন ।

পতিব্রতা রেবতী যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অন্ধকারময় দেখিলেন ।  
এককালে যেন শতসহস্র বজ্র আসিয়া তাঁহার নস্তকে দারুণ আঘাত  
করিল । বিষম ব্যথায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে গেলেন, কিন্তু হায় !  
তিনি একটু কাঁদিতেও পারিলেন না । তাঁহাকে যে গলা ছাড়িয়া  
কাঁদিতে নাই,—তিনি যে আজ চোরের মা ! চোরের মাকে কি

ডাকিয়া কাঁদিতে আছে ? অহো ! তাঁহাকে বুকভরা হৃৎ-সন্তাপ বৃকেই চাপিয়া রাখিতে হইল ।

সতীর এ ভাব কিন্তু অধিকক্ষণ রহিল না । পতিব্রতার স্বাভাবিক ভাব তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল । তিনি মনে করিলেন, বিশ্বম্ভর দাস আমার পতি, আর আমি হইতেছি তাঁহার সহধর্ম্মিণী । পতির অতিথিসেবা পরম ধর্ম্ম, তাঁহার সেই ধর্ম্মানুষ্ঠানে আমার সর্ব্বতো-ভাবে সহায় হওয়াই আবশ্যিক । পুত্রশোকের যথেষ্ট সময় আছে, এখন পতির ধর্ম্মই রক্ষিত হউক । আর পুত্রই বা কি, তাহাও তো পতির অনুগ্রহেই পাইয়াছি । পতিই সতীর একমাত্র গতি,—সেই পতিরই ধর্ম্ম রক্ষিত হউক ।

পতিভক্তির প্রবল আবেগে পতিব্রতার পুত্রশোক তৃণধণ্ডের ন্যায় কোথায় উড়িয়া গেল । তাঁহার মুখকমল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল । তিনি হাসিতে-হাসিতে বিশ্বম্ভরদাসকে বলিলেন,—স্বামিন্, আর বিলম্ব করিবেন না, শীঘ্র সাধুগণকে ঘৃত প্রদান করুন ।

বিশ্বম্ভরদাসও মহানন্দমনে সাধুগণের নিকটে ঘৃতভাণ্ড লইয়া গমন করিলেন এবং বিলম্বজনিত অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে ঘৃত প্রদান করিলেন । সাধুগণও ঘৃত পাইয়া পরমানন্দে পাকভোজনাদি সমাধানপূর্ব্বক বিশ্বম্ভরদাসকে বলিলেন,—রাত্রি অধিক হইয়াছে, বাবা তুমি ঘরে যাও, ভগবান্ তোনার সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল করুন ।

সাধুবৃন্দের চরণে প্রণাম করিয়া বিশ্বম্ভরদাস আপন গৃহে আগমন করিলেন । পতি-পত্নী উভয়েই সে রাত্রে একটুও

ঘুমাইতে পারিলেন না । পুত্রের অগণিত গুণ এবং শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্ম চিন্তা করিতেকরিতেই তাঁহাদের রাত্রি কাটিয়া গেল ।

এদিকে সেই বড়লোকের বাড়ীতে মহা ছলছুল বাধিয়া গিয়াছে । সে হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার দেখে কে ? রাত্রি প্রভাত হইতে-না-হইতে সেই মুণ্ডহীন শরীরটা সদর রাস্তার মাঝে ফেলিয়া মহা হাঁকডাক আরম্ভ হইয়া গিয়াছে । দেখিতেদেখিতে কাতারেকাতারে লোক জড় হইয়া গেল । এ ওকে ঠেলে, সে তাকে ঠেলে, সেই ধড়টি সকলেরই সর্বাগ্রে দেখিবার ইচ্ছা । দেখিলও শতশত লোকে, কিন্তু কাণ্ডার যে ধড়, তাহা কেহই সনাক্ত করিতে পারিল না । কেবল বৃথা তর্ক ও কথা-কাটাকাটিতেই সে স্থানটা কোলাহলময় হইয়া উঠিল । তখন সেই ধনবান্ সেই খণ্ডিত দেহটিকে গ্রামের বাহিরে লইয়া গিয়া শূলের উপর চাপাইয়া দিলেন । সেখানেও অনেক লোক জড় হইয়া গেল । যে দেখিল, সে-ই ধড়টির উপর নানা প্রকার গালাগালি বর্ষণ করিতে লাগিল,—কেহকেহ বা অঙ্গভঙ্গী সহকারে ঠাট্টা-বিদ্ৰূপও করিতে থাকিল । মুণ্ডহীন পিণ্ড লইয়া রঙ্গরস কতক্ষণই বা চলিতে পারে ? বেলাও অধিক হইতে লাগিল, যে যাহার গৃহ-অভিমুখে চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিল ।

এদিকে আবার সাধুবন্দ বিশ্বম্ভরদাসের নিকট বিদায় লইয়া যাইবার জন্ত তাঁহাকে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিলেন,—বিশ্বম্ভর দাস ! ওহে ও বিশ্বম্ভর দাস ! শীঘ্র বাহিরে আইস, আমরা আর অধিকক্ষণ থাকিব না ।

বিশ্বম্ভরদাস তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন । আসিবার সময়

পত্নীকে বলিয়া আসিলেন, আমি সাধুগণের সমীপে যাইতেছি, তুমি রঘুনাথের সেই মুণ্ডটি লুকাইয়া লইয়া আইস । আমি সেটি সাধু-সকলকে দেখাইব, তাহার পর একান্ত স্থানে ফেলিয়া দিব । পত্নীও স্বামীর আজ্ঞা পালন করিলেন,—পুলের মুণ্ডটি আনিয়া স্বামীর হস্তে অন্নের অলঙ্কিতে অর্পণ করিলেন । বিশ্বস্তুরদাসও সেই মুণ্ডটি কক্ষে চাপিয়া রাখিয়া ধীরেধীরে সাধুগণের অমুগমন করিতে লাগিলেন ।

সাধুসমূহ বিশ্বস্তুরদাসকে প্রীতিভরে বলিয়া উঠিলেন,—বৎস, তোনার সেবার আমরা পরম সম্ভাব লাভ করিয়াছি, তুমি সর্ববিধ কল্যাণের অধিকারী হও । তবে আমরা এখন আসি ?

বিশ্বস্তুরদাস তাঁহাদিগকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—ঠাকুর ! আপনাদের বাহা ইচ্ছা, আমি আর কি বলিব । বিশ্বস্তুরের বিনয়-বচনে সাধুবৃন্দ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতেকরিতে চলিতে লাগিলেন । বিশ্বস্তুরদাসও তাঁহাদিগকে একটু আশু বাড়াইয়া দিবার অছিলায় তাঁহাদের গশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে থাকিলেন । এইরূপে কিছুদূর যাইবার পর সাধুগণ বিশ্বস্তুর দাসকে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন,—হাঁ হে বিশ্বস্তুর, তোমার পুত্র রঘুনাথ কোথায় ? তাহাকে যে সঙ্গে আন নাই ? কল্যা রাত্রে সে আমাদের অত সেবা-শুশ্রূষা করিল, অত আদর-আপ্যায়ন করিল, আর আজ তাহার একবারও দেখা নাই ? তুমি যাও, শীঘ্র রঘুনাথকে লইয়া আইস, আমরা তাহার সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিয়া তবে বিদায় লইব ; নচেৎ আমরা এই স্থানেই থাকিয়া যাইব ।

সাধুগণের কথা শুনিয়া বিশ্বস্তুর মুখে আর কিছুই বলিলেন না ।

কেবল ছলছলনেত্রে সাধুগণের দিকে চাহিয়াই রহিলেন । দরদর অশ্রুধারে তাঁহার বদন-বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল । বিশ্বস্তরের অশ্রুদর্শনে সাধুগণের সহজকরণ হৃদয় গলিয়া গেল । তাঁহারা ব্যথিত-চিত্তে বলিতে লাগিলেন,—বাবা বিশ্বস্তর ! তুমি কাঁদিতেছ কেন ? তোমার দুঃখবিপত্তির কথা অকপটে আমাদের কাছে বল, কোন ভয় নাই, আমরা তাহার প্রতিকার করিব । ইহা শুনিয়া বিশ্বস্তরদাস আপন কক্ষ হইতে রঘুনাথের মুণ্ডটি বাহির করিলেন এবং সেটি সাধুগণের পদপ্রান্তে রাখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন । উঠিয়া কৃতাজলি করযুগল কপালে রাখিয়া একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—ঠাকুর, এই,—এই দেখুন আমার পুত্র রঘুনাথ । হায় প্রভু, বিধাতার লিপি অখণ্ডনীয়—অখণ্ডনীয় !

দেখিয়া-শুনিয়া সাধুসকল যেন ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন । ভাবিলেন,—বুঝি কোন ছষ্ট লোক রঘুনাথের মস্তকচ্ছেদন করিয়াছে । তাই রোষকষায়-নেত্রে তীব্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—বিশ্বস্তর, শীঘ্র বল, কে তোমার পুত্রের মস্তক স্থিখণ্ডিত করিল ? আমরা এখনই সেই পাষাণের সমুচিত দণ্ড প্রদান করিব,—তাঁহার বংশ নির্বংশ করিয়া দিব ।

শুনিয়া বিশ্বস্তর বলিলেন,—প্রভু, ইহাতে অশ্রু কাহারও কিছুই দোষ নাই, দোষ আমারই—আমার দক্ষ অদৃষ্টেরই । বলিয়া বিশ্বস্তর সেই তাঁহাদের জন্ত ঘৃত চুরি করিতে যাওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে সকল কথাই বর্ণনা করিলেন । শেষে বলিলেন,—

“ভাগ্যে মূঁ অরিজিচ্ছি যাহা । অবশ্য ভুঞ্জিবই তাহা ॥”



সাধুবৃন্দ বিশ্বস্তরের, তাঁহার পত্নী ও পুত্রের অতিথিতক্তি, ধর্মরক্ষার্থে দেহাদিতে অনাসক্তি প্রভৃতি দেখিয়া অপার আনন্দ লাভ করিলেন এবং প্রীতিভরে বলিয়া উঠিলেন,—বৎস, তোমার জীবন ধন্য, তোমরা পত্নীর জীবন ধন্য, তোমার পুত্রেরও জীবন ধন্য । তোমরা নশ্বর দেহের বিনিময়ে সেই অবিনশ্বর বস্তু অর্জন করিবার প্রকৃত অধিকারী । তোমাদের জয় হউক । আমাদের অবস্থান-কালের মধ্যে যে তোমার পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, ইহাও দৈবের খেলা বলিতে হইবে । চল তোমার পুত্রের মুণ্ডহীন দেহ যে স্থানে আছে, তুমি সেই স্থানে আমাদিগকে লইয়া চল, কোন চিন্তা নাই, তোমার পুত্র পুনর্জীবন লাভ করিবে ;—যাহার প্রাণে এত বিমল ধর্মভাব—এত ভগবানে ভালবাসা, তাহার বিনাশ নাই—অকালমৃত্যু তাহার হইতেই পারে না । চল বিশ্বস্তর চল, তোমার পুত্র জীবন লাভ করুক,—যুগযুগান্তর ধরিয়া তোমার যশে ভুবন ভরিয়া রহুক ।

ইহা শুনিয়া বিশ্বস্তরদাস, সেই গ্রামের বাহিরে—যেখানে শূলের উপর পুত্রের শিরোহীন শরীর স্থাপিত, সেখানে সাধুগণকে লইয়া গেলেন । তাঁহারাও শূলের উপর হইতে শবশরীরটী নামাইয়া সকলে মিলিয়া ঘিরিয়া বসিলেন । তার পর সেই ছিন্ন মুণ্ডটি ধড়ের সহিত ছুড়িয়া দিলেন । তাহার উপর তুলসীদল অর্পণ করিলেন এবং ভক্তিগদগদ-ভাবে বলিতে লাগিলেন,—

“বোইলে—ধর্ম যেবে সত । নিশ্চয় বধু এ বালুত ॥  
প্রভুমহিমা যেবে সত । পুরাণ যেবে হেব তথা ॥

যে প্রাণী পর-উপকারে ।

কি অবা হরিভজনরে ॥

কি দীনরক্ষণনিমন্তে ।

কি অবা সাধু সেবা-অর্থে ॥

অনলে পশিলেক যাই ।

ত্রাহি করন্তু ভাবগ্রাহী ॥”

যদি ধর্ম সত্য হয়, এ বালক নিশ্চয় জীবন লাভ করিবে  
প্রভুর মহিমা যদি সত্য হয়, পুরাণ শাস্ত্র যদি প্রকৃত হয়, তবে এ  
বালক নিশ্চয় জীবন লাভ করিবে ; যে ব্যক্তি পরের উপকার করে,  
কিংবা হরিভজনে নিরত থাকে, অথবা দীনজনের রক্ষণের নিমিত্ত  
কিংবা সাধুসেবার জন্তু বিপদের অনলে আত্মসমর্পণ করে, ভাবগ্রাহী  
ভগবান্ তাঁহাকে ত্রাণ করেনই করেন ।

এই কথা বলিতে-বলিতে সাধুগণের সে এক ভাবই আলাদা হইয়া  
পড়িল । তাঁহারা তাঁহাদের হৃদিহারী শ্রীহরিকে লক্ষ্য করিয়া সমস্বরে  
বলিয়া উঠিলেন—ভগবন্, এ বালক মরিবে কেন ? শরণাগতের  
রক্ষক—ভবভয়ের বজ্রধর্ম তুমি থাকিতে এ বালক মরিবে কেন ?  
মহিমময়, তোনার অপার অনন্ত মহিমা তো জগতে নিরন্ত প্রচারিত  
রহিয়াছে, তাহা তো আর মিথ্যা বলিবার যো নাই ; তাই বলি প্রভু,  
তোনার সেই মহিমার গুণে এই বালক জীবন লাভ করুক । আর  
যদি এ বালকের জীবন না-ই দাও, তবে এই লও নাথ ! আমাদের  
সকলের জীবন তোনার চরণতলে উৎসর্গ করিলাম । আহা প্রভু,  
ঐ বালক যে আমাদেরই জন্তু আপন জীবন বিনর্জন দিয়াছে ।  
গোবিন্দ হে, এই পুতচিত্ত শিশুটিকে রক্ষা কর প্রভু—রক্ষা কর ।

সংসারের লোকে ধন-বল, জন-বল, দেহ-বল প্রভৃতি কত বলেরই  
কল্পনা করিয়া থাকে, কিন্তু সাধুসজ্জন কখনও সে সকল বলকে ‘বল’

বলিয়াই মনে করেন না। তাঁহাদের বল সেই সৰ্ব্ববলে বলীয়ান্ ভগবান্ —আঁর তাঁহারই স্বরূপভূত তাঁহার নানাবিধ নাম। তাই সাধুগণ তখন বারংবার সেই ভগবানেরই নাম বদন ভরিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের সেই সমুচ্চ নামধ্বনিতে সকল সংসার যেন নামময় হইয়া উঠিল। সেই নাম সংসার ছাড়াইয়া স্মদূর ভগবদ্রাজ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। সঙ্গেসঙ্গে ভক্তবৎসল ভগবানেরও আসন টলিয়া উঠিল। তিনি আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। ডাকার মত ডাকিতে পারিলে তো আর তাঁহার স্থির হইয়া থাকিবার যো নাই। তাই তিনি তখনই অলক্ষিত ভাবে তথায় আগমন করিলেন। আর সেই বালকের জীবন দান দিয়া অলক্ষিতেই চলিয়া গেলেন। এ ব্যাপার অণু কেহই কিছু বুঝিতে পারিল না, কেবল বুঝিলেন তাঁহারাই, যাঁহারা আর সকল ছাড়িয়া কেবল সেই ভগবানকে লইয়া মজিয়া আছেন।

দেগিতেদেগিতে বালক রঘুনাথ উঠিয়া বাসিলেন। তাঁহার মুখোচ্চারিত মধুর হরিক্ষনিতে চারিদিক্ ভরিয়া গেল। তিনি সাধুবৃন্দের চরণে,—পিতার চরণে বারবার প্রণাম করিলেন। সে দেশের লোক ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়সাগরে ডুবিয়া গেল। সকলেই বলিতে লাগিল, আহা এ বালকের জীবন ধন,— ইহাকে দর্শন করিলেও লাভ আছে। সাধুগণেরও আনন্দ আর ধরে না। তাঁহারা সেই বালককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,— বৎস, তোমার মনটি বড় ভাল, তাই তুমি ভগবানের কৃপায় এই নবজীবন লাভ করিয়াছ। পূর্বজীবনে তোমার নাম ছিল

রঘুনাথ, এ জীবনে তোমার নাম হইল 'সুমন' । আমরা তোমাকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিতেছি, তুমি অস্তে শ্রীহরির পাদপদ্ম লাভ করিবে । বৎস, এখন যাও, তোমার পিতার সহিত জননীর নিকটে যাও, তাঁহার তাপিতপ্রাণে শাস্তির শীতল ধারা ঢালিয়া দাও ।

এই কথা বলিতে-বলিতে সাধুবন্দ দেখিতে-দেখিতে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন । পিতাপুত্রও ক্ষণকাল যেন স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন । পরে সাধুগণের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন । রঘুনাথ দ্বারদেশে আসিয়াই একবার 'মা' বলিয়া ডাকিলেন । স্বর্গের সুখা মিষ্ট কি সেই স্বর মিষ্ট, একথা নইয়া আমাদের তর্ক চলিতে পারে, কিন্তু রেনতীর কর্ণে তাত্কা সুখা অপেক্ষাও সুমধুর বলিয়া বোধ হইল । তিনি আলুথালুভাবে বাহিরে ছুটিয়া আসিলেন । দেখিলেন, পতির পার্শ্বে তাঁহার প্রাণের পুতলী রঘুনাথই বটে ! আনন্দের আবেগে তাঁহার কণ্ঠ-রোধ হইয়া গেল । তিনি ধাইয়া গিয়া তাঁহার রঘুনাথকে বন্ধে চাপিয়া ধরিলেন । কাহারও মুখে কথাটি নাই । কথা হইল নয়নে-নয়নে । যেমনই নয়নে-নয়নে মিলন,—নয়নে-নয়নে সম্ভাষণ, অমনই নয়নে-নয়নে আনন্দের অমল জল পল্পলু করিয়া বাহির হইয়া পড়িল,—উত্তপ্ত মরুসৈকতে শুশীতল সলিলের ফোয়ারা ছুটিল ।

## বন্ধু মহান্তি ।

“দিদি ! মা কোথা গেল ? বড় খিদে পেয়েছে ।”

“মাকে তো ভাই ! দেখতে পাচ্ছিনে । কাঁদলে কি হবে ;  
চুপ কর ভাই ! চুপ কর, মা এখনই এসে খেতে দেবে এখন ।”

“আমার পেট যে জ্বলে-জ্বলে উঠছে দিদি ! আনি যে আর  
খাকতে পাচ্ছিনে দিদি ! কাল সবে একটু ফেন খেয়েছি বই ত নয় ?”

“কি করবে ভাই ! আমারও তো ঐ দশা । আমরা তবু একটু  
ফেন পেয়েছি, মা আবার ডা-ও পান নাই । না খেয়ে খেয়ে মার  
মাইয়ের ছব নেই, খুঁকীটে কেঁদেকেঁদে অস্থির হয়ে পড়েছে ।”

“বাবা কোথায় দিদি ! না হয় তাঁকেই খাবার কথা বল না !  
সুবার যে আর বাঁচিনে দিদি !”

“বাবাও সেই খাবারের যোগাড়েই বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন ।  
চুপ কর ভাই ! চুপ কর । বাবা এগেই খেতে পাওয়া যাবে এখন ।”

উড়িষ্যার অন্তর্গত যাজপুরের এক জীর্ণ কুঠীতে বসিয়া দুইভাই  
ভাই-ভগিনীতে ঐরূপ কথাবার্তা হইতেছিল । ভগিনী বড়, বয়স  
সাত বৎসর ; ভাইটি তাহার অপেক্ষা বছর তিনেকের ছোট ।  
ইহাদের আরও একটি ছোট ভগিনী আছে, তাহার বয়সক্রম সবে  
এক বৎসর হইবে । পিতা বন্ধু মহান্তি ভিক্ষাজীবী । আজ আনিলে  
কাল খাইবার আর ঘরে কিছু থাকে না । গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা  
করিয়া যে দিন যাহা মিলে, বন্ধু তাহাতেই সন্তুষ্ট ; তাহাই পতিব্রতা

পত্নীর হস্তে আনিয়া দেন। তিনিও তাহা হইতে অতিধিসেবানি  
 নিরূহ করেন, বালক-বালিকাকে খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া কিছু  
 থাকিলে পতি-পত্নী দুইজনে ভোজন করেন। দেখিতে যেন বড়  
 কষ্টের সংসার, কিন্তু পতি-পত্নীর মনে ক্রেশের লেশও নাই। তাঁহারা  
 কথানাভেই সতত সমুদ্র। ঈশ্বরে অচল বিশ্বাস ও প্রগাঢ় প্রীতিই  
 তাঁহাদের হৃদয়কে মধুময় করিয়া রাখিয়াছে। ভগবানের ভক্তই  
 তাঁহাদের প্রত্যক্ষ দেবতা। ভগবানের নামই তাঁহাদের মহামন্ত্র।  
 ভগবান এবং ভক্তের উচ্ছিষ্টই তাঁহাদের উপাদেয় আহার।  
 ভগবানু এবং ভক্তের পাদোদকই তাঁহাদের সর্বব্যাদিনাশক মহৌ-  
 যধি। তাই সঞ্চয়-সঞ্চয়হীন দরিদ্র ভিখারী হইয়াও পতিপত্নী ধনী  
 ধনী—মহাধনী। তাঁহাদের জীর্ণ কুটির, ছিন্ন কস্থা, শতগ্রন্থি বস্ত্র ও  
 কুম্ব দেহের আবরণ ভেদ করিয়া ভিতরের দিকে চাহিয়া দেখিলে  
 দেখিতে পাইবে, আনন্দ বৃষ্টি আর কোথাও নাই, সকল আনন্দই  
 বৃষ্টি ইহারা একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছেন। এই আনন্দের সংসারে  
 নিরানন্দ কখনও দেখা দেয় নাই; দেবতার রাজ্যে সর্বতান কখনও  
 ভূম্বিকি দেয় নাই। কিন্তু চিরদিন তো আর সমান যায় না।  
 প্রকৃতির নিয়মই যে তা নয়। ঐ রাজ্যে দিনের পর রাত্রি আছে,  
 জ্যোতির পর ভাঁটা আছে, বসন্তের পর বর্ষা আছে; সুখের পর  
 দুঃখও আছে। তাই এই শান্তির সংসারেও অশান্তি আসিয়া দেখা  
 দিয়াছে। শিশুর হস্তমুখরিত সংসার আর কন্দন-কোলাহলে  
 পরিপূর্ণ হইয়াছে।

শেষে দারুণ দুর্ভিক্ষ। কাহারও দ্বারে ভিক্ষা মিলে না। অন্ন-

ভাঁবে সকলেরই দেহ কঙ্কালসার । গবাদি পশুর আহারের দানে  
 চালের খড়গুলি পর্য্যন্ত ফুরাইতে বসিয়াছে । মাঠে ঘাস নাই, গাছে  
 পাতা নাই, পুকুরে পান্না নাই ; মাঝেই তাহা খাইয়া ফেলিয়াছে ।  
 তাহার উপর চুরি ডাকাতি ও মহামারি এই ত্রাহস্পর্শ আসিয়া দেখা  
 দিয়াছে । আর রক্ষা নাই । যেদিকে চাও, দেখিবে রাশিরাশি  
 মড়া ; যেদিকে কাণ পাতো, শুনিবে কেবল হৃদয়ভেদী হাহাকার  
 ক্রন্দন । শকুনি-গৃধিনীতে আকাশমার্গ পরিপূর্ণ । শৃগালগণ দিবা-  
 ভাগেই শবশরীর লইয়া টানাটানি করিতেছে । পচা ছুর্গন্ধে চারি-  
 দিক্ ভরিয়া গিয়াছে । অমুক আজ সাতদিন উপবাসী, অমুক আজ  
 কচি ছেলের হাত হইতে একটি মূড়ি কাড়িয়া খাইয়াছে, অমুক আজ  
 অভুক্ত শিশু পুত্রের মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া জলে ডুবিয়া মরিয়াছে,  
 অমুক আজ উপবাসী পরিবারবর্গের ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া  
 দেশান্তরী হইয়া চলিয়া গিয়াছে, অমুক আজ কুকুরের মাংস খাই-  
 য়াছে, অমুক নাকি আজ জঠরজ্বালার মড়ার মাংসও আহার করি-  
 য়াছে, এইরূপ কথাই কেবল মুখে-মুখে আলোচিত । বড়ই ভীষণ  
 সময়, চারিদিকেই বিষাদের বিভীষিকাময়ী মূর্তি । ছুর্ভিক্ষ ও মহা-  
 মারী প্রভৃতি রাক্ষস-রাক্ষসীগণ যেন লোল রসনা বিস্তার করিয়া  
 উন্মত্ত ভৈরব এবং রণরঙ্গিনী চণ্ডিকার স্থায় এই মহাশ্মশানে তাণ্ডব-  
 নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছে । এই ভীষণ দৃশ্য ভাবিলেও হৃদয় হুরুহুরু  
 করিয়া উঠে । বন্ধু মহাস্তির আনন্দসাম্রাজ্যেও এই ছুর্ভিক্ষদানব  
 উকিঝুঁকি মারিতে আবস্ত করিয়াছে । আজ তিনদিন তাঁহার  
 পতিপত্নীতে উপবাসী । ত্রিধা ছুটিতেছে নী, দাগাছু মাহা জুড়িয়া-

ছিল, বালকবালিকা দুইটীরই তাহা পর্যাপ্ত হয় নাই। কোলের মেয়েটিতো ফেন খাইয়াই আছে। গত কল্যা বানি ফেনে শিশুদের দিন গুজরান হইয়াছে। আজ ভাগ্যে তাহাও জুটে নাই, তাই বন্ধু মহান্তির কন্যা পুত্র দুইটীতে ঐরূপ কান্নাকাটী করিতেছে।

বন্ধু মহান্তি অনেক গ্রাম ঘুরিয়া হররাণ হইয়া এইমাত্র ফিরিয়া আসিলেন। একটি দানা চাউলও কোথাও মিলে নাই। একমুষ্টি শাকপত্রও তিনি সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। নিজের জন্তু নষ্ট, শিশু পুত্রকন্যার জন্তুই যেন একটু চিন্তিত হইয়া বাহিরবাটীতে আসিয়া বসিয়া পড়িয়াছেন, এমন সময় তাঁহার সহধর্মিণী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আহা, তাঁহার কোলের মেয়েটি কাঁদিয়া কাঁদিয়া গলা ধরাইয়া ফেলিয়াছে। বাছা আমার শুষ্ককণ্ঠে আর কাঁদিতে পারিতেছে না, কেবল থাকিয়া-থাকিয়া ফোঁপাইয়া-ফোঁপাইয়া উঠিতেছে, আর মার প্রতি এমন করুণ নয়নে চাহিতেছে যে, দেখিলে অশ্রু সংবরণ করা যায় না। আহা ঠাকুর! তুমি না বড় দয়াল, তোমার রাজ্যে এ কঠোর শাসন কেন? হায়, মা অন্নপূর্ণার অন্নসময়ে এ দারুণ দুর্ভিক্ষ কেন? বাবা বৈষ্ণবের রাজত্বে এ মহামারি কেন? এ বহুস্তের উদ্বেদ কে করিবে।

খুকীকে কোলে করিয়া পত্নী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছেন, তাঁহার নয়নে দরদর অশ্রুধারা; দেখিয়া বন্ধু মহান্তিও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। কাতর-কণ্ঠে বলিলেন,—সতি! শ্রীহরির কি যে ইচ্ছা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, উপবাস-ক্লিষ্ট শরীরে যতদূর পারি গ্রামেগ্রামে ঘুরিয়া আসিলাম, একটি



তুলুও কোথাও পাইলাম না। শাকপাতাও কোথাও চক্ষে  
ঠেকিল না। তাই বসিয়াবসিয়া ভাবিতেছি,—লীলাময় হরির এই  
লোকসংহারিণী লীলা আর কতদিন চলিবে? এ লীলা সংবরণ  
কর প্রভু! তোমার সৃষ্ট জীব, তুমি না রাখিলে আর কে-ই  
না রক্ষা করিবে? ঠাকুর! এই মর্মান্বীড়ক দৃশ্য চক্ষুচক্ষেই  
আমরা দেখিতে পারি না, আর তুমি তোনার করুণার প্রস্রবণ  
নয়নে কেনন করিয়া নিরীক্ষণ করিতেছ নাথ! এ লীলা সংবরণ  
কর প্রভু! সংবরণ কর।

পতির মুখে 'ভিক্ষার কিছুই মিলে নাই' শুনিয়া পত্নীর মাথা  
ঘুরিতে লাগিল। তিনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না। পতির  
পদতলেই বসিয়া পড়িলেন এবং বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে লাগি-  
লেন,—হায় নাথ! আমি না হয় অভাগিনী, শৈশবেই মাতা  
পিতা হারাইয়াছি, আত্মীয় বন্ধু বলিতে কাহাকেও দেখিতে পাই-  
তেছি না যে, দুইদিন তাহাদের বাড়ীতে গিয়া এই অকালটা  
কাটাইয়া আসি, কিন্তু হাঁগা, তুমিও কি আমারই মত? তোমারও  
কি আত্মীয়কুটুম্ব বন্ধুবান্ধব সখাসাঙ্গাং কেহই নাই? নিকটে  
হউক দূরে হউক, যদি কেহ থাকে তো বল, ছেলেপুলে লইয়া  
সকণে তথায় চলিয়া যাই, উভয়ে প্রাণপণে তাঁদের সেবা-  
শুশ্রূষা করি, আর এক মুষ্টি অন্ন খাইয়া জীবন রক্ষা করি। তা না  
হ'লে বাছাদের আর কাঁচাইতে পারিব না, নিজেরাও মারা যাইব।

বন্ধু মহান্তি পত্নীর কথার প্রত্যুত্তরে বলিতে লাগিলেন,—  
সতি! না, আমারও তেমন আত্মীয়-স্বজন কেহই নাই। তবে

একজন বন্ধু আছেন বটে, তিনি কিন্তু থাকেন বহু দূরে। এখান-  
থেকে পাঁচদিনের পথ হইবে। বন্ধুটী বড় ভাল।—

“পুরুষমানক উত্তম। কেহি মুহস্তি তাহু মন ॥  
আবর ভাগ্যবস্তপণে। ব্রহ্মাণ্ডে নাহি অণ্ডজনে ॥”

আমরা যদি তাঁহার কাছে যাইতে পারি, তাহা হইলে  
মকল ফুধাই চিরতরে মিটিয়া যাইবে। আহা, তাঁহার নামটি  
বড়ই মিষ্ট। তাঁহার নাম,—দীনবন্ধু। আমাদের মত দীনহীনকে  
তিনি বড়ই ভাল বাসেন।

শুনিয়া সতীর আনন্দ আর ধরে না। তিনি মহা ব্যস্ত-সমস্ত-  
ভাবে বলিলেন,—নাথ, হউক পাঁচদিনের পথ, চল সেইখানেই  
চলিয়া যাই, দীনবন্ধুর দরবারে গিয়া দারিদ্র দুঃখ দূর করিয়া  
ফেলি। নাও খোকাকে তুমি কাঁধে কর, আমি ছোটখুকীকে  
কোলে করিয়া লই, বড়খুকী চলিয়া যাইতে পারিবে এখন; আর  
জিনিষটা পত্রটা যাহা লইতে হয়, তাহাও আমিই বহিয়া  
লইয়া যাইব। নাও, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। ঘরে একটু  
তোড়ানি (আমানি) আছে, সেইটুকু খোকা-খুকীদের খাওয়াইয়া  
দেই, তুমিও মোটখাট বাধিয়া তৈয়ারি হও। নাও, আর  
বিলম্ব কোরো না। পাঁচটা দিন বই তো নয়, পথে ঘাসপাতা  
খাইতে-খাইতে পরমানন্দে চলিয়া যাইব এখন। তজ্জন্ম কোন  
চিন্তা নাই।

বন্ধু মহান্তি স্বেং হাসিয়া ইঙ্গিতেই পত্নীকে সন্মতি জানাইলেন।  
শতীও প্রস্তুত হইয়া আসিতে গৃহমধ্যে গমন করিলেন। বন্ধু

মনেমনে ভাবেন,—প্রভু! যখন জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তখন একদিন-না-একদিন মরিতেও হইবে; তাহার জন্ম কিছুমাত্র চিন্তিতও নহি। মৃত্যুভয়ে দেশত্যাগ, সে তো বাতুলেরই কন্ম। মৃত্যু নাই কোথা? তোমার পাদপদ্ম ছাড়া এমন কোন্ স্থান আছে, যেখানে মৃত্যু নাই? এখান ছাড়িয়া যেখানেই পলাই না কেন, মৃত্যু আমার কিছুতেই ছাড়িবে না, সে আমার পাছু ধরিয়াই চলিবে। তবে আমি মৃত্যুভয়ে পলাইব কেন? ঠাকুর! তুমি বিশ্বস্তর; কোথায় জলের ভিতর পৰ্কত, তাহার মধ্যে কোথায় একটি ক্ষুদ্র কীট রহিয়াছে, তাহারও রোজ-আহারের খবর যখন তুমি রাখিয়া থাক, তখন সেই আহারের দায়েই বা দেশান্তরী হইতে যাইব কেন? দেওয়া-না-দেওয়ার মালিক তো তুমিই। তা এখানেই দাও, আর অত্র কোথাওই দাও। তোমার ইচ্ছা হয় তো ঘরে বসিয়া-বসিয়াই একমুষ্টি পাইব, ইচ্ছা না হয় তো সাত-সমুদ্র তের-নদী পার হইয়াও চুঁটকি-ভিক্ষা জুটিবে না। তবে আবার দেশত্যাগ করিতে যাই কেন? 'যাই কেন?'—তাহা কি আর বলিতে হইবে? যাই,—তোমার জন্ম,—তোমার সেই মদনমোহন মুরতি দেখিবার জন্ম? হার নীলা-চলনাথ! সে দিন—সেই শুভদিন কি হইবে?—বলভদ্র-সুভদ্রার সহিত কি তোমার পাদপদ্ম দর্শন ভাগ্যে ঘটবে? যদি ঘটে, তাহা হইলে মনে করিব, দুর্ভিক্ষ-দানবই আমার বন্ধু—বন্ধুর অপেক্ষাও বন্ধু—পরম বন্ধু। মনে করিব,—সে-ই আমার বিবের মধ্যে অমৃতের অবস্থান দেখাইয়া দিল;—সে-ই আমার অমঙ্গলের

নাথারে তোমার সর্বমঙ্গল শ্রীমূর্তি সাক্ষাৎকার করাইয়া দিল।  
হউক,—নাথ ! তাহাই হউক, আশীর্বাদ কর, তাহাই হউক।  
নীলাচলে গিয়া যেন তোমার চন্দ্রবদন দর্শন করিতে পারি।

পত্নী, পুত্রকণ্ঠাদের লইয়া সাজিয়া গুজিয়া পতির নিকট হাজির  
হইলেন। তিনি আর মেটেঘাট কাঁধিবেন কি, সামান্য দুই-  
একটা জলপাত্র ও কাঁথাকম্বল লইয়া তৈয়ারি হইলেন। পুত্রকে  
কাঁধের উপর বসাইলেন, আর হরি হরি বলিয়া যাত্রা করিলেন।  
পত্নীও ছোট-মেয়েটি কোলে লইয়া পতির অনুগমন করিতে  
লাগিলেন। বড়-মেয়েটি তাঁর সঙ্গেসঙ্গেই হাঁটয়া চলিল।

দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ, পথিন্যেও ভিক্ষা বড় জুটিল না। শাকপাতা  
খাইয়াই তাঁহাদিগকে চারিদিন চালাইতে হইল। পঞ্চম দিবসে  
সন্ধ্যা হয় হয় সময়ে তাঁহারা শ্রীপুরুষোত্তমমন্ডপে আসিয়া উপস্থিত  
হইলেন। দূর হইতে শ্রীমন্দির দর্শনেই বন্ধুর ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হইয়া  
গেল। আনন্দ-গদগদ-স্বরে তিনি পত্নীকে বলিয়া উঠিলেন,—সতি !  
ঐ দেখ আমার বন্ধু দীনবন্ধুর দেউল দেখা যাইতেছে। গুনিয়া  
তিনিও যেন শরীরে নূতন বল পাইলেন ; এইবার পুত্র-কণ্ঠার প্রাণ  
রক্ষা হইবে ভাবিয়া নবীন আশায় যেন তাঁহার হৃদয় ভরিয়া গেল,  
মজিন বদন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। আহা, শুষ্ককণ্ঠে আর তাঁহার  
বাক্য বাহির হইল না, ভাবভঙ্গীতেই আনন্দ প্রকাশ করিলেন মাত্র।  
দেখিতেদেখিতে তাঁহারা সিংহদ্বারের সন্মুখে আসিয়া উপস্থিত হই-  
লেন। আনন্দে আর এ পথটুকু আসার ক্লেশ তাঁহারা বুঝিতে  
পারিলেন না, যেন কোন যাদুমন্ত্রে তাঁহাদের এ পথটুকু কেহ লইয়া

আসিল । সিংহদ্বারে আসিয়া দেখেন, বেজায় ভিড় । পটাপট বেত চলিতেছে । ভিতরে যায় কাহার সাধ্য ? বন্ধু মহান্তি শিশুদের লইয়া আর ভিড়ের মধ্যে যাইতে সাহসী হইলেন না ; দূর হইতেই পতিত-পাবন দেবকে দর্শন করিয়া চন্দ্রচক্ষু সার্থক করিলেন । দেউলের দক্ষিণদিকের ‘পেজনালা’র ( ফেন বাহির হইবার নর্দানার ) পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিলেন । একে অনশনে অবসন্ন দেখ, ভাঙার উপর দারুণ পথক্লেশ, সিংহদ্বারে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকা কিছুতেই চলিল না । কাতর শরীরে পেটের কথা মুখ ফুটিয়া কাহারও বাহির হইতেছিল না ; ক্ষণেক বিশ্রামের পর সকলেরই মুখে কথা ফুটিয়া উঠিল । পত্নী বলিলেন,—স্বামিন্ ! বন্ধুভবনে আসিয়া এ ভাবে এই পেজনালা পার্শ্বে গোরুর দলের মধ্যে বাস-বার দরকার ? ঐ দেখ, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল, নিবিড় অন্ধকার এখনই আকাশ-মেদিনী ছাইয়া ফেলিবে । তখন আবার পুত্র-কন্যা-দের লইয়া কাহার দ্বারে আশ্রয় লইতে যাইব বল ? তুমিই না হয় একবার বন্ধুর নিকট যাও, কিছু খাবারদাবার চাহিয়া আন, ছেলে-পুলেরা থাইয়া জীবন রক্ষা করুক ; নচেৎ এখন পেজপানী ( ফেন ) চাহিতে যাই কাহার কাছে ?

এমন সময় বড়খুকী ও খোকা কাঁদিতেকাঁদিতে মার হাত ধরিয়া বলিতে লাগিল,—মাগো ! বড় ক্ষুধা পেয়েছে, খাণ আর বাচে না যে মা ? কিছু খেতে দে মা, খেতে দে ।

বন্ধু মহান্তি বলিলেন,—সুন্দরি ! আমাদের আসাটা বড় অসময়েই হ’য়েছে । এ সময় বন্ধুর সহিত দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া ভার । বিশেষত

আজ নানা দেশ হইতে তাঁর আরও অনেক বন্ধু এসেছেন তাঁদের ভিড়ে দেউলে ঢোকাও কঠিন । জোর করিয়া ঢুকিতে গেলে বেত খাইয়াই মরিতে হইবে । তার চেয়ে পেজপানী পান করে আজিকার রাত্রিটা এইখানেই কাটাইয়া দেওয়া যাউক ; প্রাতঃকালে নিরিবিলিতে বন্ধুর সহিত দেখা করিয়া দুঃখ-দারিদের কথা বলা যাইবে এখন ।

পত্নীও তাহাতে সন্মত হইলেন । বলিলেন ;—আচ্ছা তাহাই হউক, এখন পেজপানী ( ফেন ) তো জান, পান করিয়া প্রাণরক্ষা করা যাউক । বন্ধু মহাস্তি পথ হইতে একটি এঁটো বুড়ুতা (মাটির ভাঁড় ) কুড়াইয়া আনিলেন, আর পেজকুণ্ড ( ফেনের চৌবাচ্চার ) বুড়াইয়া-বুড়াইয়া পত্নীর হস্তে দিতে লাগিলেন । তিনিও পুত্রকন্যা-দের পান করাইয়া নিজেও উদর পূরিয়া পান করিয়া তথায় শুইয়া পড়িলেন ।

বন্ধু মহাস্তি তখন তুটমনে তাঁহার বন্ধুরই চিন্তার নিমগ্ন হইলেন । মনে-মনে বলেন,—

“বোইলা—নমো দারুহরি । চর-অচরে অচ্ছ পূরি ॥  
সকল জীবে পড়িদাতা । তুস্তহঁ—নাহিঁ না করতা ॥  
মুঁ এখুঁ নুহই বাহর । তু নাথ ! যাহা ইচ্ছা কর ॥  
প্রভু ! এঠারে কলে হেলা । বুড়িলা চিন্তা-জলে ভেলা ॥  
ক্ষুধা-অনলে পাঞ্চজনে । পোড়ি মরুচ্ছুঁ অকারণে ॥  
তোর করুণাবারি দেই । শীতল কর ভাবগ্রাহি ॥”

ওহে দারুহরি ! তোমায় নমস্কার । তুমি এই চরাচর বিশ্বে ব্যাপিয়া রহিয়াছ । তুমিই সকল জীবের সমস্ত বাঞ্ছিত দান করিয়া থাক ।

পরিয়া রাখিয়াছি । ভক্তের উপহৃত হৃদয়—হৃদয় ছাড়া আর কোন্-  
 খানেই বা রাখিব বল ? আমার আদেশ,—তুমি কল্যাই একখানি  
 স্মরণপদক প্রস্তুত করাইতে চাও, তাহার মধ্যে এই পত্রখানি অতি  
 সন্তর্পণে রাখিয়া দিয়া সোণার শিকলীতে সংলগ্ন করিয়া আমার  
 গলায় ঝুলাইয়া দিতে চাও । আদেশ সম্বন্ধে প্রতিপালন কর ভে  
 উত্তম, নচেৎ তোমার মঙ্গল নাই । এই বলিয়া জগন্নাথ অন্তর্হিত  
 হইলেন । মহাপাতকেরও নিদ্রাভঙ্গ হইল । তিনি এদিক-ওদিক  
 তাকাইয়া দেখেন, কেহই কোথাও নাই । বাই হউক, তিনি আর  
 শব্দ্য থাকিতে পারিলেন না । তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন ।  
 অতি প্রত্নাষেই স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া শ্রীমন্দিরে গমন করিলেন ।  
 স্নানের কথা তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া রহিয়াছে । তাই তিনি প্রভুর  
 শ্রীমুখ না দেখিয়া অগ্রে হৃদয়ের দিকেই চাহিয়া দেখিলেন । দেখিয়া  
 তাঁহার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না ! ধন্য ভগবানের ভক্তবাৎসল্য,  
 ভাবিয়া তিনি অধীর হইয়া পড়িলেন । তিনি তখন অশ্রুপূর্ণনয়নে  
 দাক্ষরির বদন পানে চাহিয়া কৃতাজলিপুটে বসিতে লাগিলেন,—  
 দয়ানয় ! আমি মহা অপরাধী, আমার অপরাধ ক্ষমা কর । আগে  
 তো জানিতাম না যে, তোমার ভূত্যের প্রতি এতই করুণা । তোমার  
 ভক্তের বা ভক্তপ্রীতিরই প্রভাব বসিতে হইবে, তোমার ভক্ত কৃষ্ণ-  
 প্রিয়ার পত্রের ক্ষণিক সংসর্গ পাইয়াছিলাম বলিয়াই আজ আমার  
 মোহাকার বিস্মৃত হইয়া গেল, তোমার এবং তোমার ভক্তের  
 মহিমোজ্জ্বল মূর্তির সাগাৎকার লাভ করিলাম । নাথ ! কই এত-  
 দিন তো তোমায় দেখিয়াও দেখিতে পাই নাই । তোমার ভক্ত

কৃষ্ণপ্রিয়ার পরম্পরা-সম্বন্ধেই আমার এই সৌভাগ্যের উদয় হইল । ঠাকুর ! ধন্য তুমি, তোমার ভক্তও ধন্য ধন্য ! ঠাহাদের পরম্পরা-সম্বন্ধের এত প্রভাব, ঠাহাদের সাক্ষাৎ-সংবন্ধের কথা তো চিন্তা-পথেই আনিতে পারি না । হায় প্রভু ! আমি মহা মূর্থ, মহা অজ্ঞান, আমার অপরাধ ক্ষমা কর ক্ষমা কর । আমি এখনই তোমার স্বপ্নের আদেশ প্রতিপালন করিতেছি, আমার ক্ষমা কর নাথ ! ক্ষমা কর ।

বন্ধু মহাপাত্র এইরূপে জগন্নাথের অনেক সুবস্তুতি করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন । তার পর শ্রীপ্রভুর গলাদেশ হইতে সেই পত্রখানি খুলিয়া লইলেন এবং ঠিক সেই মাপের একখানি সুবর্ণপদক গড়াইয়া তাহার মধ্যে পত্রখানি পূরিয়া স্বর্ণহারে গ্রথিত করিয়া দয়াময়ের গলায় পরাইয়া দিলেন । ভক্তাধীন ভগবানের শোভা যেন তাহাতে শতগুণ বর্দ্ধিত হইল ;—পদকের ছলে ভক্তের অপরি-সীম প্রশংসার সুবর্ণপদক ভগবানের বক্ষে জল্জল্ জলিতলাগিল ।

পর-পর ঠাকুর ! পদক পর । ও পদক তোমারই গলায় সেজেছে ভাল, তুমিই পর । তোমার ভক্ত যে মানমর্যাদা চায় না,—স্বাভি-প্রশংসার ধার ধারে না, সে কি দিলেও পদক গলায় ঝুলাইত ? সে পরিবে না বলিয়াই তো তুমিই পরিয়াছ,—ভালই করিয়াছ ; পর-পদক তুমিই পর । পরিতেই বা ক্ষতি কি আছে ? তাতে তোমাতে তো আর তফাৎ নাই,—তোমাদের যে হৃদয়ে-হৃদয়ে মরমে-মরমে জড়া-জড়ি । তাই বলি পদক তুমিই পর ;—সেজেছে ভাল তুমিই পর ।



শ্রীশ্রীগৌরবিধূর্জয়তি ।

## ভক্তের জয় ।

পূর্ব-ভাষ ।

জয় দিই কার ?—ভক্ত না ভগবানের ? ইহার উত্তরের জন্য বড়-একটা ভাবিতে হয় না । স্বয়ং ভগবানইত শ্রীমুখে বলিয়াছেন—  
'মহুভক্তপূজাভাধিকা' । শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনদাসের ভাষাতেই ইহার অনুবাদটা শুনাইয়া দিই,—

“আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড় ।

সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দঢ় ॥”

তাই আমরা ভক্তের জয় ঘোষণা করিতে বাধ্য হইলাম । এক কাণ্ডে দুই কাজই হইয়া গেল । ভগবানের জয় দিলে বোধ হয় শুধু ভগবানেরই জয় ঘোষণা করা হইত, কিন্তু ভক্তের জয়ে—ভক্তেরও জয়,—ভগবানেরও জয় ।

ভক্তচরিত্রের ছত্রেছত্রে ভক্তের অপ্রতিহত প্রভাব প্রকাশিত ;—ভগবানেরও ভক্ত-প্ৰীতির পূত-প্রবাহ প্রবাহিত । আর সেই ভক্ত-চরিত্র লইয়াই ভক্তের জয় দিগ্দিগন্তে প্রচারিত । আমাদের এ 'ভক্তের জয়'ও সেই ভক্ত-চরিত্র লইয়া ।

পূর্বে বাংলা ভাষায় রীতিমত ভক্তমাল ছিল না । নাভাজীর হিন্দী ভক্তমাল ও তাহার প্রিয়াদাসের হিন্দী টীকা অবলম্বন করিয়া বাঙালী লালদাস ( অপর নাম কৃষ্ণদাস ) বাংলা পড়ে ভক্তমাল গ্রন্থ প্রকাশ করেন । তাহা ছাড়া রীতিমত ভক্তমাল এদেশে আর নাই । উৎকলদেশে একখানি ভক্তমাল উৎকল ভাষায় প্রচারিত আছে । তাহার নাম “দার্তা-ভক্তি-রসামৃত” । আমাদের দেশে উক্ত গ্রন্থ-  
তাহার ভাল লাগিলে অধ্যাবধি অপ্রকাশিত । অথচ ঐ চন্দ্র-ভক্তি-  
যবে আসিলেন । তালা-চাঁদে দেখিতে পাওয়া যাইবে ( হৃদয়ের

দেশবাসীকে ঐ চরিত্রগুলি শুনাইবার লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া বাংলা ভাষায় তাহার প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভক্ত-চরিত্র প্রকাশের ভাষা আমার আয়ত্ত না থাকিলেও আশা আছে, ভবিষ্যতে কোন উপযুক্ত ভক্ত কবি পুষ্পিত ভাষায় ইহার সৌন্দর্য্য-সুখমা ফুটাইয়া তুলিবেন এবং কবিত্ব-গন্ধে দেশবাসীকে পরমানন্দিত করিবেন।

বর্তমান গ্রন্থে আটটি ভক্ত-চরিত্র প্রকাশিত হইল। ইহার মধ্যে সাতটি সুবিখ্যাত সাপ্তাহিক 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় এবং একটি (দামোদর দাস) প্রসিদ্ধ মাসিক 'অবসর' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বন্ধুবান্ধবের সনির্বন্ধ অনুরোধে এই আটটি চরিত্রে এক খণ্ড প্রকাশ করা গেল। সাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধিতে পারিলে অন্যান্য চরিত্রগুলিও ক্রমশ প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

শেষ একটি কথা বলিয়া রাখি, আমি উৎকল-ভক্ত-চরিত্রের আক্ষরিক অনুবাদ করি নাই। আমাদের দেশের রীতিনীতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া—আমাদের ছাঁচে সেগুলিকে ঢালিয়া লইয়াছি। তজ্জন্ম উৎকল-চরিত্রের কিছুকিছু কাটছাঁট অদলবদলও করিতে হইয়াছে। চরিত্র-চিত্রের স্বাভাবিক বিকাশ সাধন এবং ভক্তিরসের পরিপোষণের জন্মও স্থানেস্থানে অনেক কথা জোড়াতাড়া দিতে হইয়াছে। ভাল হইয়াছে—কি মন্দ হইয়াছে, জানি না, তবে 'উৎকল-বার্তা' প্রভৃতি উৎকল ভাষার প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রে আমার লিখিত এই ভক্ত-চরিত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্বক উদ্ধৃত করায়, ইহা যে তাঁহাদের অনুমোদিত, তাহা অনায়াসে অনুমান করিতে পারি।

শ্রী শ্রীগোবিন্দ-পূর্ণিমা

শ্রীগোবিন্দ ৪২৫

শ্রীগোবিন্দ গোস্বামীর লেন,

ভক্ত-চরণ-রেণু-প্রার্থী

শ্রীঅক্ষয়

এ জগতে তুমি ছাড়া আর কর্তাও স্বতন্ত্র কেহ নাই। আমি তো সেই জগতের বাহিরের লোক নই, আমাকে ঠেলিলে চলবে কেন ? নাথ হে ! তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, কিন্তু মনে রাখিও, আমার বিষয়ে হেলা (উপেক্ষা) করিলে চিন্তার জলে আমার জীবন-ভেলা বুড়িয়া যাইবে। ওহে ভাবগ্রাহি জনাৰ্দন ! আমরা পাঁচটা প্রাণী ক্ষুধার অনলে অকারণে পুড়িয়া মরিভেছি, তুমি তোমার করুণার বারিধারা ঢালিয়া তাহা শীতল কর প্রভু !

বন্ধুর শরীরটা পথশ্রমে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিল, কিছুক্ষণ এইরূপ বলিতে-বলিতেই তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। এদিকে শ্রীজগবন্ধুর সমগ্র সেবা সন্নিহিত গেল। 'বড় সিংহার' বেশ হইল, পুষ্পাঞ্জলি দেবতা (ক্ষুদ্র ধাতুমূর্তি) আসিলেন, পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হইয়া গেল, শয্যা বিছানো হইল, প্রভুরা শয়ন করিলেন, ভাণ্ডারী ভাণ্ডারগৃহ বন্ধ করিয়া ফেলিলেন, মুহূর্তী পণ্ডা মন্দিরদ্বারে দড়ি ঝাধিয়া তাহার উপর মাটা দিয়া সেই মাটাতে 'মুদ' (মুদ্রা—মোহর—ছাপ) করিয়া দিলেন। মশালপ্রদীপ জ্বালিয়া শ্রীমন্দিরের 'বেড়া' (চারিদিক) 'শোধ' (জনশূন্য) করা হইল। চারিদিকের কপাট পড়িয়া গেল। প্রথমে শিকল দিয়া তার পর তালা দিয়া বন্ধ করাও হইল। সেবকগণ যে যাহার ভবনে চলিয়া গেলেন। দেউলে জনমানব নাই। ভক্তবৎসল ভগবানও ভূত্যের চিন্তায় বড় কাতর হইয়া পড়িলেন। সুকোমল শয্যায় শয়ন, কমলাদেবীর নাগ্রহ-সেবন আর তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি শয্যা ত্যাগ করিয়া বরাবর ভাণ্ডারঘরে আসিলেন। তালা-চাবিতে আর সেই 'অগোরনীয়ান্' (স্বপ্নের

অপেক্ষা অতি সূক্ষ্ম ) ভগবানের কি আসিয়া যাইবে ? তিনি ভাণ্ডার হইতে রত্নখালী বাহির করিলেন । তাহাতে অন্ন-ব্যাঞ্জন, খাজা-গজা, পুরী-কচুরী, ক্ষীর-সর, পিষ্টক-পরমান্নাদি প্রসাদ স্তরেস্তরে সাজাইলেন । আহা, এগুলি প্রভু অভুক্ত বন্ধুর জন্ম আগেআগেই সরাইয়া রাখিয়াছিলেন । দয়াময় স্বয়ং সেই রত্নখালী বহিয়া লইয়া দক্ষিণ-দ্বারে গমন করিলেন । দ্বার খুলিয়া ডাকিতে লাগিলেন,—বন্ধু ! ও বন্ধু !

ডাক শুনিয়া বন্ধুর নিদ্রা ভঙ্গ হইল । কিন্তু তিনি মনে করিলেন,—এ পুরীসহরে কি ‘বন্ধু’ নাম আর কাহারও থাকিতে নাই ? এ হয় তো আর কাহাকেও কেহ ডাকিতেছেন । আর যদি প্রভুই হন তো এখনই বুঝা যাইবে । একটু চুপ করিয়া থাকিয়াই দেখি না কেন ?

‘বন্ধু ! বন্ধু !’ ডাক শুনিয়া তাঁহার পত্নীও ধড়নড় করিয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং পতির প্রতি কহিতে লাগিলেন,—ওগো ঐ গুনগো তোমায় কে ডাকছে । বন্ধু বলিলেন,—কোথায় কে ডাকছে ? ‘বন্ধু’ কি আর কেউ থাকতে নেই ? নাও শুয়ে পড় ।

পত্নী কি করেন, আবার শুইয়া পড়িলেন । বন্ধু মহাস্তিও কাণ খাড়া করিয়া শুইয়াই রহিলেন । অন্তর্যামী ভগবান্ বন্ধুর হৃদয় বুঝিলেন ; উচ্চৈঃস্বরে আবার ডাকিতে লাগিলেন । এবার আর শুধু ‘বন্ধু’ বলিয়া নয়,—এবার ডাক দিলেন,—ওহে ও যাজপুরিয়া বন্ধু, ঐ যে পেজনালায় পার্শ্বে সপরিবারে শয়ন করিয়া আছ, বন্ধু ও বন্ধু এদিকে এস ভাই ! এদিকে এস, আমি তোমার জন্ম অন্নগ্রাস লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছি ।

বন্ধু মহান্তির কর্ণে সেই জলদগম্ভীর স্বর প্রবেশ করিল । তাঁহার সর্কশরীর পুলকপূর্ণ হইয়া উঠিল । তিনি আবার ভাবিলেন, সত্যই কি দীনবন্ধু আমায় ডাকিতেছেন, না, আমি স্বপ্ন দেখিতেছি ? স্বপ্নও তো নয়, ঐ যে আবার সেই স্বর শুনা যাইতেছে, ঐ যে শীঘ্র যাইবার জন্ত আবার তিনি আহ্বান করিতেছেন । সেই সর্কান্ত-ধাম্মী ছাড়া আর কে-ই বা জানিবেন যে, আমি যাজপুরবাসী বন্ধু মহান্তি ক্ষুধায় কাতর হইয়া সপরিবারে পেজনালায় পার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিয়াছি ? না, তিনিই বটেন । বাই, কথাটা কি বুঝিয়া আনি ।

বন্ধু মহান্তি শশব্যস্তে উঠিয়া দক্ষিণদ্বারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন । দেখিলেন, একজন ব্রাহ্মণ রত্নখালী হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন । বাইবাখাদ্রই তিনি বলিলেন,—বন্ধু ! এত দেবি করিয়া কি আদিত্যে হয় ? ডাকিতে-ডাকিতে যে আমার গলা চিরিয়া গেল । এই দেখ অন্নখালীর ভারে আমার হাত থরথর কাঁপিতেছে । যাও ভাই ! এই গ্রামের অন্ন খাইয়া আজিকার রাত্রিটা তো অতিবাহিত কর, কলাই তোমার আহ্বার-অবস্থানের সমস্ত বন্দোবস্তই করিয়া দিব । যাও, কোন চিন্তা করিও না ; খাইয়াদাইয়া মুহু হওগে ।

বন্ধু মহান্তি হাত বাড়াইয়া প্রভুর হস্ত হইতে রত্নখালী গ্রহণ করিলেন । শ্রীহস্তস্পর্শে বন্ধুর শরীর অবশ হইয়া পড়িল । বলিবলি করিয়া তিনি একটু কথাও প্রভুকে বলিতে পারিলেন না । প্রভুও শ্রীমন্দিরের মধ্যে চলিয়া গেলেন । বন্ধু মহান্তি কিছুক্ষণ জড়ের তায় দাঁড়াইয়া রহিলেন । ভাবেভাবে তাঁহার প্রাণ তোলপাড় করিয়া

তুলিয়াছে । তাঁহাতে আর যেন তিনি নাই । কণকাল পরে তিনি যেন মাতালের মত টলিতে-টলিতে পেজনালার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । পত্নী-পুত্রাদিকে জাগাইলেন এবং সকলে সেই রক্তখালী ঘিরিয়া বসিয়া পরমানন্দে মহাপ্রসাদ ভোজন করিতে লাগিলেন । বন্ধু মহাস্তি খাইতে বসিলেন মাত্র, কিন্তু তাঁহার আর ক্ষুতাতৃষ্ণা ছিল না, পরমানন্দেই তাঁহার ভিতর-বাহির ভরিয়া গিয়াছে । খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়া গেল । একটু জল সংগ্রহ করা ছিল, সেই জলে বন্ধুপত্নী রক্তখালীখানি ধুইয়া দিলেন । বন্ধুও সে খানি ফিরাইয়া দিবার জন্ত দক্ষিণদ্বারে গমন করিলেন । গিয়া অনেক ডাকাডাকি—দ্বার-ঠেলাঠেলি করিলেন, কিন্তু কাহারও সাড়াশব্দ পাইলেন না । কি করেন, অগত্যা ফিরিয়াই আসিলেন । একটু হেঁড়া নেকড়া ছিল, তাহাই জড়াইয়া রক্তখালীখানি নাথার শিয়রে রাখিয়া দিয়া পুত্রকন্যাদের লইয়া বন্ধুপত্নী আবার শুইয়া পড়িলেন । শুইবামাত্র সকলেই ঘুমাইয়াও পড়িলেন । কিন্তু বন্ধুর আর শয়নও নাই, নিদ্রাও নাই । তাঁহার তখন এক অগুরু অবস্থা ; সে অবস্থাটা জাগা ও ঘুমের মাঝামাঝি, অথচ স্বপ্ন বা তন্দ্রাও নয় । সে অবস্থাটা—মোহালেশ্বের অতীত,—তামস-স্থের অতীত ;—আত্মানন্দে আলোকিত কি-এক মাদকতাময়ী অবস্থা । সেই অবস্থায় থাকিয়া বন্ধু মহাস্তি কত-কিই ভাবিতে লাগিলেন । প্রথম তাঁহার মনে হইল, এই যে রক্তখালী, এটি সাক্ষাৎ প্রভুর হস্তচ্যুত ! এটি সামান্য রক্তখালী নয় ; এটি সাক্ষাৎ সেই প্রভুই । বন্ধু খালীটি লইয়া একবার বৃকে চাপিয়া ধরিলেন । তাঁহার প্রাণ

যেন জুড়াইয়া গেল । সাক্ষাৎ প্রভুর স্পর্শ পাইতেছি বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল । বুক হইতে খালীখানি লইয়া তিনি নরনে-বদনে ও মস্তকে চাপিয়া-চাপিয়া ধরিলেন, আনন্দ-মদিরার নেশা যেন আরও ঘোরাল হইয়া আসিতে লাগিল । তাঁহার শরীর যেন অবশ হইয়া পড়িল । তিনি খালীখানি মাথায় দিয়া শুইয়া পড়িলেন । মনে হইতে লাগিল, যেন প্রভুর পাদপদ্মের উপরই মাথা রাখিয়া শুইয়া আছি । আর তিনি যেন মোহাগভরে মুখে-বুকে পদ্মহস্ত বুলাইয়া দিতেছেন, তৈলহীন সংস্কারহীন রুম্ম জটাবাধা চুলগুলি ধীরেধীরে কুরিয়া-কুরিয়া দিতেছেন । চক্ষু তো বুঝিয়া ছিলই, এইবার যেন সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারেই কপাট পড়িয়া গেল । মনপ্রাণ সে কি-এক অপ্রাকৃত আনন্দে ভরপুর হইয়া গেল । ইহাকে নিদ্রা বলিতে হয় বল, আর সমাধি বলিতে হয় বল, কিন্তু বন্ধুর অবস্থাটা তখন ত্রি-বলি-বলি-বলা-যায়-না-ধরণেরই হইল ।

এদিকে রাত্রি শেষ হইয়া আসিল, কাক-কুক্কুট ডাকিয়া উঠিল । উবার অরুণরাগে চারিদিক লালেলান হইয়া পড়িল । শ্রীজগন্নাথের সেবকগণ স্নানসন্ধ্যা সমাপন করিয়া শুদ্ধভাবে শ্রীমন্দিরে আগমন করিলেন । দ্বার খোলা হইল । দেউলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলেই আপনআপন সেবায় লাগিয়া গেলেন । ভাগুরী ভাগুর খুন্সিয়া দেখেন যে, বাসন-কোসন যে ভাবে গোছান ছিল, সেভাবে নাই ; কে সব ওলটপালট করিয়া ফেলিয়াছে । দেখিতেদেখিতে আরও দেখেন যে, সর্কনাশ ! প্রভুর রত্নখালী একখানি নাই ! তিনি মদ্য হাঁ হুতাক ছাড়িয়া বাহিরে আসিলেন । ব্যাপার কি জানিবার

জ্ঞান চারিদিক হইতে সেবক সকল ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন । ভাগ্যবান বলিলেন,—সর্বনাশ সর্বনাশ, কল্যা রাতে দেউলে ডাকাতি পড়িয়াছে, প্রভুর রত্নখালী চুরি করিয়া লইয়া পলাইয়া গিয়াছে । গোলমাল শুনিয়া প্রহরীরাও আসিয়া জুটিল । “দেউলের ভিতর চুরি ডাকাতি করিতে বাহির হইতে অন্য চোর কে আসিবে, এ কার্য সেবকদেরই,”—বলিয়া তাহারা সেবকদের উপর চড়োয়া হইল । সে মারমার কাটকাট তর্জনগর্জন দেখে কে ? শেষ যত দোষ গিয়া পড়িল বেচারী ‘সোয়ার’ ( সুপকার ) পাণ্ডাদের উপর । সকলেই সিদ্ধান্ত করিলেন, রক্তনের অনুরোধে তাহারা রাতে রক্তন-শালায় ছিল, একাজ ওদেরই হইবে, অন্য কাহারও নয় । ধর ওদেরই ; রত্নখালী এখনই বাহির হইবে । আহা, প্রহরিগণ তাঁহাদের জোড়াজোড়া করিয়া বাধিয়া পিঠে পটাপট বেত মারিতে আরম্ভ করিয়া দিল । তাঁহাদের ক্রন্দনরোলে দেউলের ভিতরটা ভরিয়া গেল । এই কথা লইয়া সমগ্র পুরীসহর সরগরম হইয়া পড়িল ।

দৈবেরই খেলা, যে রত্নখালীর জ্ঞান এত কাণ্ড, এত হাঙ্গাম-ছজ্জত, এত নির্দোষের নির্যাতন, সেই রত্নখালী মাথায় দিয়া বন্ধু মহাস্তি মহানন্দে নিমগ্ন রহিয়াছেন । নির্দোষ বন্ধু মহাস্তি কি আজ দৈবের এ খেলার অব্যাহতি পাইবেন ? না না, আজ আর তাঁহারও অব্যাহতি নাই । রত্নখালী আজ একটা মহা হলমূল কাণ্ড না বাধাইয়া আর ছাড়িতেছেন না ।

পেজনালায় পার্শ্বে বন্ধু মহাস্তি সপরিবারে শুইয়া আছেন । তাঁহার মাথায় সেই ছেঁড়া নেকড়াতে বাধা রত্নখালী । ছেঁড়া



মোকড়ার কাঁক দিয়া রত্নখালীর চক্চকানি দেখা যাইতেছে । বিশেষতঃ সূর্য্যকিরণে তাহার জলুয যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছে । হঠাৎ তাহা একজনের নজরে পড়িয়া গেল । আর যায় কোথা, সে মহা গোলমাল করিয়া লোক জড় করিল, আর লক্ষ্যক্ষয় করিতেকরিতে বলিতে লাগিল,—পাকড়াও পাকড়াও বেটাকে ; রাত্রে চুরি করে মুষ্টি চম্পট দিবার সুযোগ পায় নাই, তাই বেটা মটকা মেঝে এই-খানে পড়ে আছে । ধর, ধর বেটাকে, শীগ্গির শীগ্গির ধর, নইলে বেটা এখনই পলাইয়া যাইবে ।

বলাও যা, আর অমনি জন-সাথেক লোক লোক দিয়া গিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিল । বন্ধুরও আনন্দনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল । অবাক্ হইয়া চাহিয়া দেখেন,—বিপরীত কাণ্ড ! ‘ব্যাপারটা কি ?’ জিজ্ঞাসা করিবারও আর তিনি অবসর পাইলেন না । কতকগুলি লোক তাঁহার মাথার নীচে হইতে খালীখানি জোরে ছিনাইয়া লইল, কতক লোকে তাঁহার হাতে-পায়ে শিকলী দিয়া বাঁধিয়া ফেলিল, তার উপর যে যত পারিল—চড়চাপড়টা ঘুবীঘাঘাটা বসাইতে লাগিল । আর গালাগালির তো অবধিই নাই, সে যেন শ্রাবণের বারিধারার ঞ্চার চারিদিক হইতে বর্ষণ হইতে থাকিল ।

বন্ধু মহাস্তির দুর্দশা দেখিয়া স্ত্রীপুত্রাদি কান্নার হাট বসাইয়া দিলেন । বন্ধু কিন্তু অচল অটল । তিনি থাকিয়া থাকিয়া ‘গোবিন্দ গোবিন্দ’ করিয়া উঠিতেছেন, আর সেই তাড়ন-ভৎসন অকাতরে সহ্য করিতেছেন । এ শরীরের সহিত যেন তাঁহার কোন সম্বন্ধই নাই,—এ শরীরের সুখদুঃখে মুষ্টি তাঁহার কিছুই করিতে পারে না ।

প্রহার-তিরস্কারের বেগ একটু কমিয়া আসিলে বন্ধু তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন—‘ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন। আপনারা মারুন, গালাগালি দিউন, যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন ; কিন্তু আমারও ছ’একটা কথা আপনাদিগকে শুনিতে বলি।’

“হাঁঃ, বেটা চোর, ওর কথা আবার শুনতে হবে?”—এই বলিয়াই অনেকে বন্ধুর কথা উড়াইয়া দিলেন। ভাল-মন্দ সব রকমেরই তো লোক আছে, তাই কেহ বা বলিলেন,—ভাল, ও কি বলিতেছে একবার শোনোই না কেন ?

বলিবার হুকুম পাইয়া বন্ধুও তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন,—  
‘মহাশয়গণ ! আমি বিদেশী। গতকল্য এখানে আসিয়াছি। পথ-শ্রমে কাতর হইয়া স্ত্রী-পুত্রাদিসহ এইখানেই পড়িয়াছিলাম। প্রবল ক্ষুধায় শিশুসন্তানগণ কাঁদিয়া অস্থির। একটু পেজপানী ভিন্ন অন্য আহার আর জুটে নাই। করা যায় কি, পড়িয়া-পড়িয়া পতিতপাবন প্রভুকেই ডাকিতেছিলাম। রাত্রি দশদণ্ড হইবে, এমন সময়ে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া দক্ষিণদ্বার হইতে আমার ডাকিলেন। আমি তাঁহার কাছে গেলাম। তিনি এই রত্নখালী ভরিয়া নানাপ্রকার খাদ্য দিয়া চলিয়া গেলেন। আমরা সকলে মিলিয়া পরমানন্দে তাহা আহার করিলাম। পরে খালীখানি ফিরাইয়া দিতে গিয়া দেখি, দ্বার বন্ধ ; কেহই কোথাও নাই। অনেক ডাকহাঁক করিয়াও যখন গাড়াসুড়ি পাইলাম না, তখন কাজেকাজেই ফিরিয়া আসিতে হইল। তাই ঐ ভাবে ছেঁড়া নেকড়া জড়াইয়া খালীখানি রাখিয়া দিয়াছি। সত্য কথাই আপনাদের নিকট বলিলাম। এখন বলুন, আমার অপরাধ কি?’

বন্ধুর স্ত্রীও তাঁহাদিগকে ঐরূপ কথাই বলিলেন, কিন্তু তাহাতে বড় একটা কাহারও বিশ্বাস হইল না । অনেকেই বলিয়া উঠিল,— “ব্যটাবেটির কথা শোন দেখি, স্বাত্রি দশদণ্ডের সময় ওদের জন্ত রত্নখাণী কোরে কে ব্রাহ্মণ আবার খাবার দিতে এসেছেন ? বেটাকে বন্দিশালে নিয়ে চল, দুদিন ঠাণ্ডা গারদে থাকিলেই সব ভগ্নামী ভেঙ্গে যাবে এখন ।” ছুষ্ঠের দল চিরদিনই পুষ্ট । তাহারা বন্ধু মহান্তিকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া বন্দিশালায় লইয়া গেল এবং গারদঘরে বদ্ধ করিয়া রাখিল । বন্ধুর পত্নী ও পুত্রকন্যা পেজমালার পার্শ্বে ই পড়িয়া রহিলেন । আহা তাঁহাদের কল্পণ ক্রন্দন শুনিলে পাষণ্ডও বিদীর্ণ হইয়া যায় ।

বন্ধুকে বন্দিঘরে দিয়া, গালাগালি দিতে দিতে প্রায় সকলেই আপন-আপন গৃহে চলিয়া গেল । যাইলেন না কেবল দুই চারিজন । তাঁহারা বন্ধুর পত্নী-পুত্রাদিকে সাঙ্ঘনা দিয়া বলিলেন,—বাছা ! তোমাদের কোন ভয় নাই, তোমরা এইখানেই থাক, আহাৰাদি আমরাই জোগাইব । সত্যের জয় অবশ্যই হইবে, তিনি সত্বর কারা-মুক্ত হইবেনই হইবেন । বলিয়া তাঁহারা ছেলেদের জন্ত কিছু খাবার দিয়া চলিয়া গেলেন ।

কারাবদ্ধ বন্ধুর হস্ত-পদ লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ । একটু নড়িবার-চাড়িবার যো নাই । কিন্তু তাহাতেও তাঁহার অণুমাত্র চাঞ্চল্য বা ক্লেশানুভব নাই । তিনি আনন্দমনে সেই দীনবন্ধুরই পাদ-পদ্ম ভাবিতে লাগিলেন । এত অপমান এত তাড়ন-তিরস্কার পাইয়াও তাঁহার মনোমধ্যে একবারও এ ভাবের উদয় হয় নাই

যে, ঠাকুর! কাল যে রাত্ৰিকালে তুমি বলিলে—ফলাই তোমার  
আহার-আবাসের বন্দোবস্ত করিয়া দিব, এই অজস্র গালা-  
গালিই কি আমার আহার, আর কারাবাসই কি আমার আবাস  
নিরূপিত হইল প্রভু!

এরূপ অবস্থায় তোমরা-আমরা হইলে বোধ হয় এর চেয়েও  
বেশী রকম দুই-চারিটা কড়া কথা না শুনাইয়া আর ছাড়িয়া  
দিতাম না। তা তিনি ভগবানই হউন, আর যিনিই হউন।  
কিন্তু বন্ধুর মনের কোণেও এ ভাবের কথা একবারও উকিঝুঁকি  
মারে নাই। তিনি ঈশ্বরবিদ্বানী, তার উপর কর্মফল মানেন।  
তাই তিনি সূচতুর কর্ণধারের দ্বায় কর্মের শত ঝঙ্কারে শত  
তরঙ্গের আঘাত সহ্য করিয়াও অবিচলিতভাবে দেহ-তরঙ্গী  
চালাইয়া চলিয়াছেন। বিপদ দেখিয়া তাঁহার ভয় বা চাঞ্চল্য  
হইবে কেন? তিনিও যে তাঁহার ক্রম নক্ষত্র—তাঁহার কম্পাসের  
কাঁটা ভগবানের দিকেই দৃষ্টি স্থির রাখিয়াছেন।

তোমার যদি গুনিবার কাণ থাকে তো ঐ গুন, কারাবন্ধ  
বন্ধু মনেমনে কি বলিতেছেন। বন্ধু বলিতেছেন,—

“বোলে— মুঁ পাপী অপরাধী।	তুস্তে যে করুণাবারিধি ॥
ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে পাপিজনে।	মো-পরি নাহিঁ অন্তজনে ॥
তো-পরি পতিত-তারণ।	অচ্ছি কে ব্রহ্মাণ্ডমধ্যেণ ॥
এণু তু যাহা কলে কর।	অন্ত শরণ নাহিঁ মোর ॥”

ঠাকুর! আমি বড়ই পাপী, বড়ই অপরাধী; সেই পাপের  
ফলেই আমার এই নির্ঘাতন। ইহাতে তোমার কিছুই দোষ নাই;

কেননা তুমি যে করুণার সাগর । প্রভু ! এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে আমার মত পাপী ব্যক্তি আর ছইটি নাই । কিন্তু তোমার মত পতিত-তারণই বা কে আছেন ? তাই বলি নাথ ! তুমি যাহা করিতে হয় কর । কিন্তু জানিয়া রাখিও, আমার আর অন্য শরণ নাই । আশ্রয় বল, রক্ষক বল, তুমিই আমার সকলই ।

ভক্ত এত ব্যাকুল ভাবে প্রভুকে ডাকিতেছেন, তাঁহার কি আর শান্তি আছে ? অথচ নিত্য নিয়মিত সেবা না সরিলেও কিছু করিতে পারিতেছেন না । তিনি বড় ব্যতিব্যস্তেই পড়িয়া গেলেন । দেখিতেদেখিতে দিনটুকু কাবার হইয়া গেল । প্রভুর সন্ধ্যা-আরতি, সন্ধ্যা ধূপ ( রাত্রিকার ভোগ ), চন্দনলাগি (শ্রীঅঙ্গে চন্দনলেপন ), বড়সিংহার ( পুষ্পবেশ ) ও পছড় ( শয্যায় শয়ন করানো ) প্রভৃতি সেবাও ক্রমেক্রমে সরিয়া গেল । দেউলের 'বেটা শোধ' করিয়া ঘারে তালা দিয়া সেবকগণও চলিয়া গেলেন । প্রভুও সত্বর শয্যা ত্যাগ করিয়া গুরুড়ের উপর চাপিয়া গগনমার্গে গিয়া চড়িলেন ; হুকুম দিলেন,—গুরুড় ! খোরধা ( বর্তমান খুবদা ) রথি-পুরে প্রতাপরুদ্র রাজার প্রাসাদে শীঘ্র লইয়া চল । গুরুড়ও 'যে আজ্ঞা' বলিয়া সন্সন্ করিয়া বায়ুবেগে তাঁহাকে লইয়া চলিলেন এবং নিমেষমধ্যে প্রভুকে রাজতবনে পহুছাইয়া দিলেন ।

গভীর রাত্রি । মহারাজ তখন অন্তঃপুরে পালঙ্কের উপর স্নখে নিদ্রা ষাইতেছেন । ভাবগ্রাহী ভগবান্ ভক্তের ভাবে বিভোর হইয়া সেই-খানেই গমন করিলেন এবং স্বপ্নমার্গে রাজাকে বলিতে লাগিলেন,—ওহে রাউত ! (রাজন্) আমার আজ্ঞা শ্রবণ কর । প্রথম একটা কথা

জিজ্ঞাসা করি, তোমার গৃহে যদি বন্ধুবান্ধব আসে, তবে কি তাহারা উপবাসী হইয়াই ফিরিয়া যায় ? ইতর লোকের ঘরেও আত্মীয়কুটুম্ব আসিলে তাহাকে পেট কোলে করিয়া ফিরিয়া যাইতে হয় না ? আর কোথায় যাজপুর, সেখান থেকে আমার একটা বন্ধু সপরিবারে আমার বাড়ীতে আসিয়াছে, আমিই তাহাকে আমার রত্নখালী করিয়া ভোজন করিতে দিই । তোর বাপের পুঁজিপাটা তো কিছু ভাঙ্গিতে যাই নাই, আমারই রত্নখালী আমি তাহাকে দান করিয়াছি । খালী খানি বন্ধুর কাছেই ছিল । আর তোর লোকজন কিনা তাহাকে 'চোর' অপবাদ দিয়া ধরিয়া লইয়া গেল ? আহা, তাহার হাতে-পায়ে বাঁধিয়া নাটীতে ফেলিয়া যেমন মারিতে হয় মারিল, তার পর দুইটা পায়ে শিকলী লটকাইয়া কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিল । আহা, তাহার স্ত্রীপুত্রাদির দুর্দশার কথা আর কি বলিব । বন্ধুর জন্ত তাহারা ব্যাকুলপ্রাণে হাহাকার ক্রন্দন করিতেছে । তাই আমি তোমায় আজ্ঞা দিতেছি, যদি মঙ্গল চাও তো সত্বর ক্ষেত্রে গমন কর । যাইয়া আমার বন্ধুকে কারামুক্ত করিয়া দাও, তাহার পায়ের শিকলী কাটাইয়া সেই পায়ের তলে পড়িয়া সম্মানিত কর । তার পর তীর্থজলে তাঁহাকে স্নান করাইয়া সূক্ষ্ম বস্ত্র পরাইয়া দাও এবং নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া দেউলের হিসাবরক্ষকের কার্যে নিযুক্ত কর । কাহাকেও কোন নূতন কর্ম্মে বাহাল করিতে হইলে যেমন তাহার মাথায় 'শাটী' ( পিরোপা ) বাঁধিয়া দিবার প্রথা আছে, বন্ধুর মস্তকেও সেইরূপ 'শাটী' বাঁধিয়া দিবে । আর আজীবন বহুতে উত্তম ভোজন লাভ করিতে পারে, তাহারও বন্দোবস্ত করিয়া

দিবে । যাও, আর বিলম্ব করিও না । সত্বর আমার আদেশ পালন করগে । না কর তো জানিও, তোমার রাজ্যে আর মঙ্গল নাই । আমি কে, জান ত ?—আমি সেই নীলাচলনাথ নারায়ণ ।

ভগবান্ রাজাকে এই কথা বলিয়া, তাঁহাকে চেতাইবার জন্তু 'সপাং' করিয়া এক ঘা চাবুক মারিয়া, গরুড়ে আরোহণ-পূর্বক নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন । রাজাও উঠিপড়ি করিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া পড়িলেন । তাড়াতাড়ি বাহিরবাটীতে বিজয় করিলেন । পাত্র-মিত্রকে ডাকাইয়া সকল কথা বলিলেন । তখনই তাঁহার 'বারু লাগি' ( বাহিরে যাইবার সাজগোজ ) হইল । তিনিও নীলাচল অভিমুখে চলিলেন । তথায় পৌঁছাইতে তাঁহার বড় বিলম্ব হইল না । তিনি বরাবর বন্দিমন্দিরেই গমন করিলেন । কারাগৃহের দ্বার যুক্ত করাইয়া অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন । স্বপ্নাদিষ্ট সকল কথা হাতে-হাতে মিনাইয়া লইলেন । দেখিলেন, হাঁ যাজপুরবাসী জনৈক ব্যক্তি রক্তখালী চুরির অপরাধে কারারুদ্ধ রহিয়াছে বটে । তাঁহার আর অবিশ্বাস রহিল না । তিনি তৎক্ষণাৎ বন্ধুর পার্শ্বে গমন করিলেন । বন্ধনমোচনের জন্তু প্রহরীদের আদেশ দিলেন । প্রহরিগণ বন্ধন মোচন করিল । মহারাজও পরমাদরে বন্ধুকে কোলে লইলেন, বুকে বুক লাগাইয়া বলিতে লাগিলেন,—অহো আমার জীবন ধন্য, বহু ভাগ্যে আজ তোমার বদন দর্শন হইল । আমার লোকজন তোমার কাছে বড়ই অপরাধ করিয়াছে, সে অপরাধ তাহাদের নহে, আমারই হইয়াছে । তোমায় তাহা ক্ষমা করিতেই হইবে ।

বন্ধু মহাস্থি বিনয়ের খনি । তিনি নৃপতিকে বলিতে লাগিলেন,—মহারাজ ! আমি অতি তুচ্ছ, অতি ঘৃণিত, সামান্ত করণজাতি ; আপনি এ মহাপাতকীকে স্পর্শ করিবেন না স্পর্শ করিবেন না । মহারাজ ! আমার মত অপরাধী জগতে আর নাই । আপনিই আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন ; আপনার আবার অপরাধ কিসের ? আমায় ছুঁইবেন না ছুঁইবেন না, ছাড়িয়া দিউন ছাড়িয়া দিউন ।

মহারাজ কিন্তু কিছুতেই ছাড়িলেন না । তিনি অনেক সাধ্যসাধনা করিয়া তাঁহাকে লইয়া গেলেন । তীর্থজলে স্নান করাইয়া বসনভূষণে ভূষিত করিলেন । দেউলের হিসাবরক্ষক কার্যে নিয়োগস্থচক তাঁহার মাথায় ‘শাটী’ বাঁধিয়া দিলেন । তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদিকে আনাইয়া নানা প্রকারে সম্মানিত করিলেন । দেউলের দক্ষিণ পার্শ্বে বাসভবনের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন । বাসন-কোসন আসবাব-পত্র প্রভৃতিরও বন্দোবস্ত হইয়া গেল । যাহাতে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে উপাদেয় প্রসাদ পাইতে পারেন, তাহারও লিখিত আদেশ দান করিলেন । পরে বহমান সহকারে বন্ধুকে শ্রীমন্দিরে প্রভুর সম্মুখে লইয়া গিয়া সর্ববিধ দানের সমর্পণ-পত্র ( দসিল ) তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন । নৃপতির মনের ভাব,—ঠাকুর ! এই দেখ তোমার সম্মুখেই তোমার আদেশ প্রতিপালন করিলাম, আর আমার অপরাধ নাই ।

মহারাজ শ্রীজগবন্ধুকে প্রণাম করিয়া, বিনয়-বচনে বন্ধুর কাছে বিদায় লইয়া আপন ভবনে গমন করিলেন । ভক্তের প্রভাব ৩

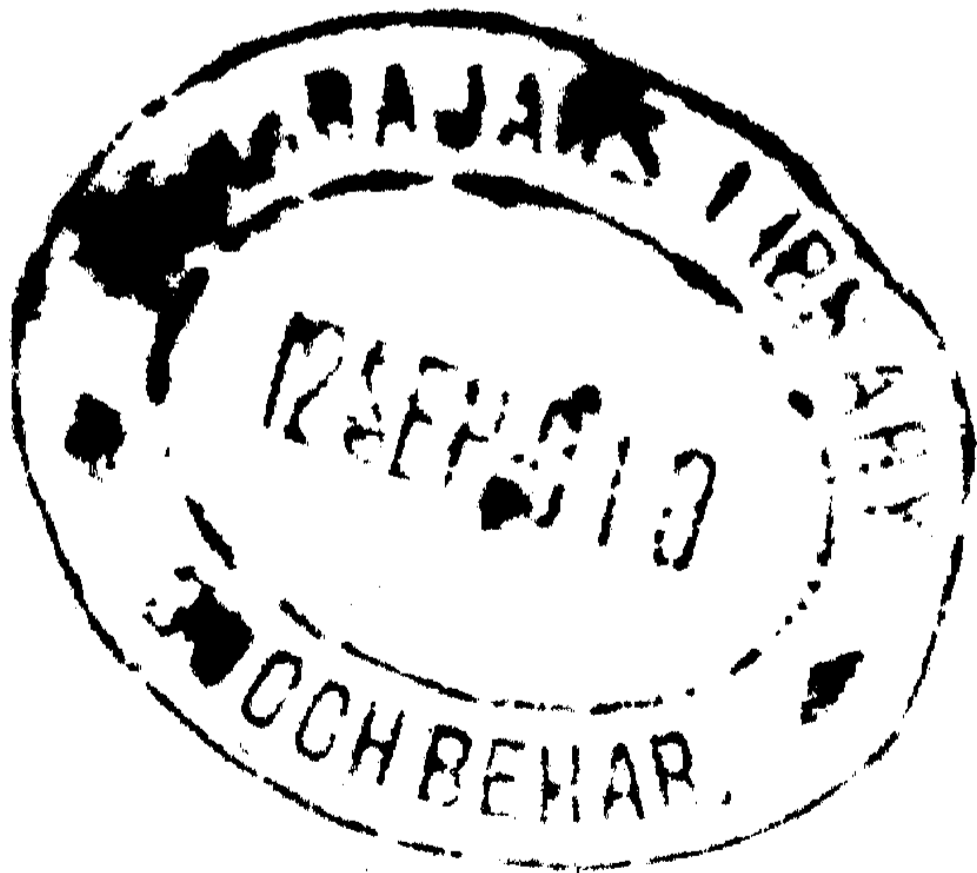


ভগবানের ভৃত্য-প্রীতি দর্শনে সকলেই ভক্ত ও ভগবানের জয় জয় করিতে লাগিলেন। মুখেমুখে চারিদিকে এ কথা প্রচার হইয়া পড়িল। কল্যাণহারা বন্ধুকে গালাগালি দিয়াছিল, প্রহার করিয়াছিল, দলেদলে তাহারা আসিয়া বন্ধু মহাস্তির পদতলে পড়িতে লাগিল, ক্ষমা ভিক্ষা করিতে থাকিল। বন্ধু জোড়হস্তে মানা করিলেও তাহারা আর মানা মানে না, বন্ধুর চরণ ধরিয়াই তাহারা বারবার ক্ষমা-ভিক্ষা করিতে লাগিল। বন্ধু কিন্তু আপনাকে বড়ই অপরাধী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। অত লোকের সঙ্গে একা আর পারিয়া উঠিলেন না বলিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বলিতে কি, এই ব্যাপার দেখিয়া অনেক নাস্তিক-পাষণ্ডেরও প্রাণে আস্তিক্যবুদ্ধি আসিল; তাহাদের হৃদয়ও ভক্তিদেবীর অধিবাস-যোগ্য হইল।

বন্ধু ! তোমার বন্ধু নাম সার্থক। তোমার পিতা-মাতা বোধ হয় সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন; তা না হ'লে তোমার বন্ধু নাম রাখিবেন কেন? ভগবান্ যাঁহাকে 'বন্ধু' বলিয়া সম্বোধন করেন, তাঁহাব জীবন ধন্য। ভক্তবর তোমার চরণে প্রণাম। এ জগতে আমরা কল্পনার দৃষ্টিতে অনেক বন্ধুই দেখিতে পাই, কিন্তু তুমিই যথার্থ বন্ধু দেখিয়াছিলে। যেমন তুমি, তোমার বন্ধুও তেমনই। কে ছোট, কে বড়, বুঝা ভার! দুঃখ-দারিদ্র্য দিয়া তিনি তোমাকে চিনাইয়াছেন। কতটা সহ্যশূন্য, কতটা দৃঢ়তা হইলে যে তাঁহাকে বন্ধু করিতে পারা যায়, তাহা তিনি তোমাকে দিয়াই বুঝাইয়াছেন। আবার সামান্য একটু ঐকান্তিক ভাবের বিনিময়ে

তিনিও যে কতটা করুণা বিস্তার করিয়া থাকেন, বন্ধু ! তাহা তো তুমিই দেখাইয়া দিলে । এ জগতের স্বার্থপর বন্ধু যে বন্ধু নয়— তিনিই যে একমাত্র বন্ধু, তাহা তো তুমিই চিনাইয়া দিলে ? তাই বন্ধু ! তোমার চরণে বারবার প্রণাম করি, আশীর্বাদ কর, যেন কোন-না-কোন জনমে তোমার মত দুঃখের দহন সহন করিয়া তোমার বন্ধু সেই জগবন্ধুকে বন্ধু করিতে পারি,—“হে কৃষ্ণ করুণাসিকো দীনবন্ধো জগৎপতে !”—বলিয়া তাঁহার চরণে সর্বস্ব সমর্পণপূর্বক প্রণত হইতে পারি ।

জগবন্ধু যাহার বন্ধু, তাঁহার আর অভাব কিসের, কষ্টই বা কিসের ? বন্ধু মহাস্তি পরম সুখে সপরিবারে সেই নীলাচলেই অবস্থান করিতে লাগিলেন । সেই অবধি জগবন্ধুর আয়ব্যয়-হিসাব-রক্ষার কার্য তাঁহার বংশীয়েরাই করিতে থাকিলেন ।



## রঘু অরক্ষিত ।

কে বলিল এ সংসারে সুখ নাই ? কে বলিল স্বর্গেই কেবল সুখা মিলে ? কে বলিল মরুজগতে অমরধামের পারিজাত-সৌরভ সুচরিত ? যাও—বঙ্গদেশে, হরিপুর সহরে—কৃষ্ণচন্দ্র মহাপাত্রের ভবনে, তোমার মনের সন্দেহ দূর হইয়া যাইবে। তাঁহার পত্নী কমলাকে যাইয়া জিজ্ঞাসা কর, তোমার প্রতি-কথার প্রত্যুত্তর তাঁহারই কাছে পাইতে পারিবে।

কৃষ্ণচন্দ্র মহাপাত্র একজন মহা ধনশালী ব্যক্তি। সংসারে তাঁহার কিছুই অভাব নাই,—হস্তিশালায় হস্তী, অশ্বশালায় অশ্ব, দাস-দাসী নায়েব-নফর কিছুই অভাব নাই, অথচ তাঁহার প্রাণে কি যেন কিসের অভাব সতত বর্তমান। অতিথি-অভ্যাগতের কলকল রবে তাঁহার অতিথিশালা সর্বদাই মুখরিত, ধূপ ধূনা গুণ্গুলের পবিত্র সৌরভে ও স্তুতিগীতির মঙ্গল ধ্বনিতে তাঁহার দেবালয় সকল সর্বদা পরিপূরিত, সর্বদাই তাঁহার প্রশংসা প্রচারিত, তথাপি তাঁহার প্রাণে যেন আকাশযোড়ী আসর লইয়া বসিয়া আছে। একা তাঁহারই যে এই দিশা, তাহা নয়, পত্নী কমলারও অবস্থা পতিরই অনুরূপ। কমলার অত যে রূপ, সেই কি-এক সামগ্রীর অভাবে সে রূপও যেন দিনদিন উপিল্লা যাইতে লাগিল। এইরূপে কিছুদিন যায়, বিধাতার ইচ্ছায়, দম্পতীর হৃদয়ের অভাব যেন কতকটা শান্ত হইয়া আসিল,—কমলার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল।

দেখিতে-দেখিতে দশ মাস পূর্ণ হইয়া গেল । বহু ভাগ্যে আজ কমলা একটু পুত্র সন্তান লাভ করিয়াছেন । পতিপত্নীর এতদিনের প্রাণের অভাব আজ একবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে । কৃষ্ণচন্দ্র মহাপাত্র আজ দুই হাতে করিয়া ধনরত্ন বিলাহিতেছেন । আনন্দবাঞ্চে ও দাতার জয়জয়রবে গৃহপ্রাঙ্গণ ভরিয়া গিয়াছে । আর কমলমুখী কমলা সজোজাত শিশুকে কোলে লইয়া তাহার মুখচন্দ্র বারবার দেখিতেছেন, আর মনেমনে বলিতেছেন,—কে বলিল, এ সংসারে সুখ নাই ? আজ আমাদের মত সুখী কে ? কে বলিল স্বর্গেই কেবল সুখা মিলে ? আহা, সুখা যে আমার শিশুর বিধাধরেই উছলিয়া পড়িতেছে । কে বলিল, মর-জগতে অমরধামের পারিজাত-সৌরভ সুদূর্লভ ? আমার বাছার অঙ্গগন্ধের কাছে ছার সে পারিজাতের সুগন্ধ ।

পিতামাতার সোহাগের শিশু দেখিতেদেখিতে পঞ্চম মাস অতিক্রম করিল । মহা সমারোহে তাহার নামকরণ ও অন্নপ্রাশন হইয়া গেল । কুলপুরোহিতের নিদেশক্রমে শিশুর নাম হইল রঘুনাথ । একজন জ্যোতির্বিৎ পণ্ডিত আদিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে বলিয়া গেলেন,—মহাপাত্র ! তোমার পুত্র ~~কৃষ্ণচন্দ্র~~ অংশে জন্ম ; কালে এ একজন মহাজন হইবে ; দেখো যেন হুহার অযত্ন না হয় । অযত্ন হইবে ? পিতামাতার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম পুত্রের অযত্ন হইবে, ইহা কি কখনও হইতে পারে ? তথাপি ঐ দিন হইতে পিতামাতার আরও যেন একটু সতর্ক দৃষ্টি পুত্রের উপর পড়িল । ক্রমে-ক্রমে রঘুনাথ হামাগুড়ি দিতে, তার পর আলগোছা দাঁড়াইতে, তার পর চলিচলি

পা-পা করিয়া হুঁচার পা চলিতে শিথিল । অল্পদিনের মধ্যেই দোড়া-দোড়ি করিয়া বেড়াইতেও শিথিয়া ফেলিল । আর রক্ষা নাই, রঘুনাথ আর বাড়ীতে থাকে না, একটু ফাঁক পাইলেই একদৌড়ে ঠাকুরবাড়ী চলিয়া যায় । তথায় যাইলে তাহার আনন্দ যেন শতগুণ বাড়িয়া উঠে । সে কখনও ঠাকুরের সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণাম করে, কখনও তুলসীমঞ্জের চারিদিকে ঘুরিয়াঘুরিয়া বেড়ায়, আবার কখনও বা ছবাহ তুলিয়া হরিসঙ্কীৰ্তনে নৃত্য জুড়িয়া দেয় ।\* পিশুর খেলা দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে, আর পরস্পর বলাবলি করে,—বাঁচে তো এ ছেলোটো একজন যথার্থ ভক্ত হইবে ।

এইরূপে কিছুদিন যায়, রঘুনাথ আর এখন বালক নাই, সে ষোড়শ বর্ষ অতিক্রম করিয়া সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে । তাহার অঙ্গে-অঙ্গে আত্ম যৌবনের অপূর্ণ সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে । একদিন কমলা স্বামীর কাছে পুত্রের শুভবিবাহের প্রস্তাব করিলেন । স্বামীও পরমানন্দে তাহাতে সম্মতি দিলেন এবং একটি পরমাম্বুন্দরী কন্তার জন্ত দেশেদেশে ঘটক প্রেরণ করিলেন । কত দেশে কত পাত্রীই দেখা হইল, কিন্তু ঠিক মনের মত আর হয় না ; অবশেষে মধ্যবাস্তালার কলাবতীপুরে গঙ্গাধর করণের কন্যা অন্নপূর্ণাই সকলের পসন্দসই হইল ।

গঙ্গাধর করণ গুণবান্ বলিয়া বিখ্যাত না হইলেও কুবেরের মত ধনবান্ বলিয়াই বিখ্যাত । তাহার উপর্যুপরি সাতটি পুত্র, তাহার পর সবে মাত্র এই একটি কন্যা । অন্নপূর্ণা বাপমার বড়ই আদরের মেয়ে । রঘুনাথ যেমন সর্বগুণাধিত সর্বাঙ্গসুন্দর পাত্র, অন্নপূর্ণাও

তাহার সর্বাংশে উপযুক্ত পাত্রী। উভয় পক্ষের কথাবার্তা স্থির হইয়া গেল, বিবাহের দিন-লগ্নও অবধারিত হইল। শুভবিবাহের অন্তত একমাস পূর্ক হইতে কৃষ্ণচন্দ্র ও গঙ্গাধরের ভবনে আনন্দোৎসব আরম্ভ হইয়া গেল। নাচ গান বাজনা বাজিপোড়ানা প্রভৃতি আমোদপ্রমোদ পুরাদমে চলিতে লাগিল। দীয়াতাং ভুজ্যতাং রবের তো আর বিরামই নাই। নিরুপিত দিনে শুভবিবাহও সম্পন্ন হইয়া গেল। রঘুনাথ অন্তপূর্ণাকে লইয়া গৃহে আসিল। বধুর মুখ দেখিয়া কমলার আর আনন্দ ধরে না। তিনি পুরন্ধীগণের উলুউলু মঙ্গল ধ্বনির মাঝে বরকন্যা বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের গৃহ একা কমলার রূপের আলোকেই এতদিন আলোকিত ছিল, আজ আবার অন্তপূর্ণার রূপের আলোকে অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

হইল সব,—সংসারী লোকে যাহা চায়—পুত্র পুত্রবধু হইল সব, কিন্তু ভাগ্য তো কাহারও হাতধরা নয়, কৃষ্ণচন্দ্রের অদৃষ্টচক্রের কেমন আকস্মিক পরিবর্তন আরম্ভ হইল। এত সুখ তাঁহার কপালে মহিল না। কয়েক বৎসর অজন্মায় জমিদারীতে শস্ত ভাল জন্মায় নাই, প্রজাদের কাছে খাজনা আদায় হয় না, তাহার উপর তাঁহার দয়ার শরীর, পীড়ন করিয়া খাজনা আদায় দুরে থাকুক, বরং প্রজাবর্গের দুঃখ দেখিয়া তিনি অবিশ্রান্ত ঘর হইতে তাহাদের শস্ত অর্থ জোগাইতে লাগিলেন। এইরূপে দেখিতেদেখিতে তিনি ক্ষীণবিত্ত হইয়া পড়িলেন। দেশের জমিদার বা রাজাই তিনি। মানসন্ত্রম বজায় রাখিবার জন্ত ব্যয়সংক্ষেপও করিতে পারেন না। কাজে-

কাজেই তাঁহাকে ঋণজালে জড়িত হইয়া পড়িতে হইল । ঋণের মত পাপ নাই । সেই মহাপাপ কৃষ্ণচন্দ্রের পুণ্যের সংসার অন্নদিনেই ছারখার করিয়া দিল । অবিশ্রান্ত হুশ্চিন্তায় কৃষ্ণচন্দ্রের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল । নানা ব্যাধি আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিল । মৃত্যু আসন্ন দেখিয়া তিনি পুত্র রঘুনাথকে নিকটে ডাকিলেন, তাহার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া কাতরস্বরে বলিলেন,—“বাবা! আমি চলিলাম, আমার একটি কথা রাখিও, মতক্ষণ পারিবে ঋণ পরিশোধ করিবে, দেখে যেন কাহাকেও ফাঁকি দিবার কথা কখনও প্রাণে না জাগিয়া উঠে, ভগবান্ তোমার মঙ্গল করিবেন ।” কৃষ্ণচন্দ্র এই বলিয়া চক্ষু মুদিত করিলেন । পতিব্রতা কমলা পুত্রের নিকটে বিদায় লইয়া পতির সহগমন করিলেন । রঘুনাথের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল । তাহার অবস্থা ভাবিলেও কষ্ট হয় । আহা ! তাহার মাতাপিতার শোক অনুভব করাও কঠিন হইয়া পড়িল । পাষণহৃদয় পাওনা-দারেরা তাহার গাত্রের মাংস ছিঁড়িয়া খাইতে লাগিল ।

অনুপূর্ণা বড়লোকের আদরের মেয়ে । প্রায় পিত্রালয়েই থাকে । তাহার পিতা বা ভ্রাতৃগণ অত্যন্ত কৃপণ-স্বভাব । তাঁহারা লোক-পরম্পরায় রঘুনাথের অবস্থা শুনিয়াও শুনিলেন না । রঘুনাথও সহজ ছেলে নহে, সে তাঁহাদের অপেক্ষা আরও অনেক গুণে বড়-লোকের খবর রাখিয়া থাকে, তাই সাহায্যভিক্ষার জন্ত ঋণুরবাড়ীর দ্বারের ত্রিসীমাও মাড়াইল না । যাহা কিছু বিষয়-বৈভব ছিল, তাহা দিয়া পিতার ঋণ পরিশোধ করিল । ঋণুরবাড়ী হইতে যাহা যৌতুক-স্বরূপ পাইয়াছিল, তাহা পুরোহিতের হস্তে সমর্পণপূর্বক দেবদেবার

বন্দোবস্ত করিয়া দিল এবং স্বয়ং ছিন্ন কস্থা ও কোপীন সম্বল করিয়া গৃহের বাহির হইয়া পড়িল ।

বিধাতারই লীলা । একটি বৃক্ষে দুইটী ফুল ফুটিতেছিল । আর অমনি কোথা হইতে দুরন্ত কালকীট আসিয়া তাহাদের বৃন্তে বাসা করিল । আহা ! তাহাদের ভাল করিয়া ফুটিতেও দিল না ; তাহারা অল্পবিস্তর সুবনা ছড়াইয়া, অল্পবিস্তর সৌরভ বিলাইয়া শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িল । এইবার রঘুনাথ ! তোমার ফুটিবার দিন আসিয়াছে, তুমি ফোট । তুমি ভগবানের ভক্ত—পদ্মজাতীয় পুষ্প ; দুঃখ-দারিদ্র্যের প্রচণ্ড তপনতাপেই তোমায় ফুটিতে হইবে ; তুমি প্রস্ফুটিত হও ! তোমার ঐ ছিন্ন মলিন বস্বেই শৈবাল-সংবৃত পঙ্কজেরই মত তোমার শোভা শতগুণ বদ্ধিত হইবে,—তোমার ভক্তি-সৌরভে বিগ্নব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া যাইবে । তোমার ফুটিবার দিন আসিয়াছে, ফোট রঘুনাথ ! তুমি ফোট ।

রঘুনাথ গ্রামেগ্রামে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিলেন । কষ্টের আর অবধি নাই । বড়লোকের ছেলে । দুঃখ কাহাকে বলে জানিতেন না । একবারে এত কষ্ট সহিবে কেন ? একদিন গভীর রাতে এক বৃক্ষতলে বসিয়া রঘুনাথ মনেমনে বিচার করিতে লাগিলেন,—আমি এইরূপ গ্রামেগ্রামে অকারণে ঘুরিয়া বেড়াই কেন ? কেবল পশুর মত আহার-নিদ্রাতেই বা লাভ কি ? তাহার অপেক্ষা এক কাজ করা যাউক,—কোন পুণ্যক্ষেত্রে চলিয়া যাই, আর সেইখানেই ভগবানের নাম লইয়া জীবন যাপন করি । তাই বা যাই কোথায় ? শুনিয়াছি ;—



“সকল জীবের কর্তা । ভগতি-মুক্তির দাতা ॥  
কমলাদেবী-প্রাণপতি । দীনবান্ধব জগজ্জ্যোতি ॥  
বিজয় শ্রীনীলকন্দর । কষু-রথাস্ত্র ধরি কর ॥”

যিনি সকল জীবের কর্তা, ভক্তি ও মুক্তির দাতা, যিনি কমলা-  
দেবীর প্রাণপতি, দীনের বন্ধু ও জগতের জ্যোতিঃস্বরূপ, তিনি  
শঙ্খচক্র ধারণ করিয়া শ্রীনীলাচলে বিরাজ করিতেছেন। ভাল,  
সেইখানেই চলিয়া যাই। সেই প্রভুর সম্মুখে যাইয়া সকল দুঃখ-  
ক্লেশের কথা বলি। তারপর যাহা করিবার তিনিই করিবেন।  
আর কিছু না হউক, সাক্ষাৎ কৈবল্যস্বরূপ মহাপ্রসাদ ভোজন হো-  
ভাগ্যে ঘটিবে? যদি তাহাই না-ই জুটে—অনশনেই মরি, তাহাতেও  
ত দুঃখ নাই; সেই মহাপুণ্যক্ষেত্রে মরিলেও ত পবিত্র হইবে? এই  
পরামর্শ ই ভাল। বলিয়া রঘুনাথ নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করি-  
লেন। অল্পদিনেই তথায় যাইয়া পহুছিলেন এবং শ্রীজগবন্ধুর মুখপদ্ম  
দর্শন করিয়া কৃতাজলিপুটে কহিলেন,—

“পিতা-জননী ছুই মলে । মোতে অনাথ করি গলে ॥  
এগুটি রঘু অরক্ষিত । তো পাদে শরণ বাঞ্ছিত ॥  
তো প্রভু যাহা ইচ্ছা কর । কিনিলা দাস মুহিঁ তোর ॥”

প্রভু হে! আমার পিতামাতা ছুইজনেই মরিয়াছেন,—আমাকে  
অনাথ করিয়া গিয়াছেন। আজ রঘু ‘অরক্ষিত’—রক্ষকহীন হইয়া  
পড়িয়াছে। তাই ইচ্ছা হয় প্রভু! তোমার পাদপদ্মেই শরণ গ্রহণ  
করি। আমার ইচ্ছা হইলেই বা কি হইবে? তোমার ইচ্ছাই তো  
ইচ্ছা? এখন তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। কেবল জানিয়া  
রাখিও, আমি তোমার ক্রীত-কিঙ্কর।

রঘুনাথ যেন দেখিতে পাইলেন, শ্রীপ্রভু পদ্মহস্ত তুলিয়া বলিতে-  
ছেন,—“রঘু ! তোমার ভয় নাই ভয় নাই, তুমি এইখানেই মহা-  
প্রসাদ ভোজন করিয়া পরমানন্দে বিচরণ কর, আমি তোমায় ভূতা  
বলিয়া স্বীকার করিলাম ।” তিনি প্রভুর আশ্বাসনাগী শিরোধার্য  
করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন । কোন দিন কোন  
বৈষ্ণবের গৃহে, কিংবা কোন দিন কোন মঠধারীর মন্দিরে, যেদিন  
যেখানে জোটে মহাপ্রসাদ ভোজন, আর যখন তখন প্রভুর পদ্মসুখ  
দর্শন, ইহাই হইল তাঁহার একমাত্র কার্য । বলিতে কি, রঘুনাথের  
প্রাণে এখন এতই আনন্দ যে তাঁর আর পূর্বের কথা কিছুই  
মনে পড়ে না—অন্নপূর্ণার সদা-প্রফুল্ল মুখকমনও একবার মনোদ্রব্যে  
জাগিয়া উঠে না ।

এইরূপে কিছুদিন যায়, রঘুনাথের শ্বশুরালয়ে এই কথা প্রচার  
হইয়া পড়িল । একদিন গল্পাধর করণ স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া এ বিষয়ে  
এক পরামর্শসভা বসাইলেন । প্রথমেই তিনি বলিলেন,—ছিছি  
লজ্জার কথা লজ্জার কথা, হাড়হাকাতে জানাইতে কি না, জগন্নাথে  
গিয়ে ভিক্ষে মেগে বেড়াচ্ছে ? অতটা বিবয়-বৈভব, হতভাগা কি না  
সব নষ্ট ক’রে ফেলে ? ওঃ বাপের দেনা ? বাপের দেনা তো তোর  
কিরে বাপু ? আমি যে ষোতুকে অত ধনরত্ন দি রেছিলাম, লক্ষ্মীছাড়া  
সেগুলো চুলোর দোরে দিলে পথের ভিখারী হোলো ? হায় হায়  
মাথা যতদূর হেঁট হবার তা হয়েছে । আর না আর না, আর তাঁর  
নামও কেহ মুখে এনো না ; এখন এক কার্য্য কর, অন্নপূর্ণার  
আবার বিবাহের আয়োজন কর । মনে কর যে, তাঁর বিবাহ ইয়ই

মাই । আহা, হতচ্ছারা জামাইটে বাপ খেয়েছে, মা খেয়েছে, বাড়ী-ঘর-দোর, টাকা কড়ি সব খেয়েছে, তার হাতে প'ড়লে কি মা আনার আর বাঁচবে ? সে তা হ'লে মাকেও আনার টপ করে খেয়ে ফেলবে । না, না, তার নাম আর মুখে এনো না, মুখে এনো না, অন্নপূর্ণার নূতন বরেরই আয়োজন কর । আহা, মার আমার মলিন মুখ দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যার ।

যেমন গুণধর গঙ্গাধর, তাহার স্ত্রীপুত্রস্বাও তেমনই । গঙ্গাধরের মতেই সকলে সম্মতি দিলেন । আশ্চর্য্য ! একথা কাহারও মুখ হইতে বাহির হইল না যে, ভাল রঘুনাথকে আবার কিছু টাকাকড়ি দিয়া বাড়ী ঘর দোর করাইয়া কাছেই রাখা হউক না কেন ? অধাশ্মিক রূপণ করণ-পরিবার বিবাহিতা কণ্ঠার বর খুঁজিতেই ব্যস্ত হইলেন । পাত্র পাইতেও বড় বিলম্ব হইল না । সেই স্বজ্যেয় রাজমন্ত্রী ; নাম বহু মহাপাত্র ; তাহার পুত্রের সহিত অন্নপূর্ণার বিবাহ স্থির হইয়া গেল । মন্ত্রিপুত্র যার-পর-নাই দুর্কৃত্ত ও অধাশ্মিকের অগ্রগণ্য । তাহার উপর অন্নপূর্ণার রূপজ মোহে সে এতই অভিভূত যে, বিবাহিতা কণ্ঠার পাণিগ্রহণে একটু ইতস্তত করিল না । গঙ্গাধর ও মন্ত্রিপুত্র উভয়েই ধনবান্ ব্যক্তি, সুতরাং তাঁহাদের কার্য্যে দেশের লোকেও কেহ প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইলেন না । জ্যোতিষী আসিয়া বিবাহের দিনও স্থির করিলেন, আগামী ফাল্গুনমাসের শুক্লাপঞ্চমীর দিন শুভ লগ্নে শুভ বিবাহ হইবে ।

অন্নপূর্ণা সকলই শুনিতেছেন । তিনি আর তখন নিতান্ত

বালিকা নহেন ; তাঁহার বয়স পঞ্চদশ পার হইয়া গিয়াছে । ব্যাপার  
বুঝিয়া তিনি নিতান্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন । কেবল ভাবেন, হা  
ভগবন্ ! এ আবার কি করিলে ?

“মো প্রাণনাথ খাউ খাউ । বিভা করিবে মোতে আউ ॥  
মুঁ পুনি ধরি এ শরীর । বদন চাহিঁ বি কাহার ? ॥”

হায় প্রভু ! একি অসম্ভব কথা ; আমার প্রাণনাথ জীবিত  
থাকিতে-থাকিতে আমাকে আবার অগ্রে আসিয়া বিবাহ করিবে ?  
হা ঠাকুর ! এ শরীর তো আর আমার নয়, আমি যে তাঁহারই  
চরণে সমস্ত সমর্পণ করিয়াছি ; তবে এ শরীর ধরিয়া আবার অন্য  
কাহার বদন নিরীক্ষণ করিতে যাইব ? হে প্রভু ! তুমি বিপন্ন  
গজেন্দ্রকে উদ্ধার করিয়াছিলে, হে প্রভু ! তুমি সতী দ্রৌপদীর লজ্জা  
নিবারণ করিয়াছিলে । তুমি সর্কান্তর্যামী, তোমায় আর আমি  
অধিক কি জানাইব, আমার বিপদ ত তুমি সকলই জানিতেছ ।  
আমি সতী,—দ্বিচারিণী নহি ; আমাকেও এই আসন্ন বিপদ হইতে  
উদ্ধার কর প্রভু ! উদ্ধার কর ।

অন্নপূর্ণা দিবানিশি কেবল ভগবানের কাছে এইরূপ প্রার্থনা  
করেন, আর বিরলে বসিয়া কাঁদেন । আহা-নিদ্রা হাস্য-পরিহাস  
কিছুই ভাল লাগে না । কাহারও কাছে বড় একটা যানও না ।  
বাটীর পুরাতন পরিচারিকা,—সে-ই শৈশবে অন্নপূর্ণাকে মানুষ  
করিয়াছিল ; অন্নপূর্ণা কেবল তাহারই কাছে আপন চুঃখের কথা  
বলিয়া থাকেন । দাদীকে তিনি সদাই বলেন,—ধাই মা ! এ  
দেশের কি কেউ নীলাচলে যায় না ? তাহ'লে তাহারই হাতে পত্র

দিয়া পতিকে বিপত্তির কথা জানাই ; আর তিনি আসিয়া আমাকে এই বিষম বিপদ হইতে উদ্ধার করেন ?

দাসীও সংবাদ রাখে। একদিন সে আসিয়া বলিল, মা অনো ! ওই ওপাড়ার কয়েকজন জগন্নাথ দর্শনে যাইতেছেন, পত্র দাও তো শীঘ্র দাও, আমি তাঁদের দিয়া আসি। অন্নপূর্ণাও আনন্দমনে তাড়াতাড়ি একখানি পত্র লিখিলেন,—

“বোইলা—আহে প্রাণেশ্বর । মুঁ য়েবে দাসীটি তুস্তর ॥  
 আসস্তা ফাগুন মাসরে । শুকলপক্ষ পঞ্চমীরে ॥  
 এ রাজ্য-পীত্রকুমরকু । বিভা করিবে মোকে তাকু ॥  
 এথকু চাহিঁ বেগে আস । মোঠারে অচ্ছি য়েবে আশ ॥  
 আস না-আস তুস্ত মন । মুঁ এবে গণু অচ্ছি দিন ॥  
 য়েবে এ কণ্ট পরিবস্তে । দেখা ন দেব তুস্তে মোতে ॥  
 প্রাণ চ্ছাড়িবি আত্মাঘাতে । লাগিব স্তিরীহত্যা তোতে ॥”

ওহে প্রাণেশ্বর ! আমি তোমার শ্রীচরণের দাসী। আমার বিপদ শুন। আগামী ফাল্গুনমাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমীতে এই রাজ্যের মন্ত্রিপুত্র আমাকে আবার বিবাহ করিবে, স্থির হইয়াছে। যদি দাসীর আশা থাকে তো আর বিলম্ব করিও না, সত্বর চলিয়া আইস। অবশ্য আসা না আসা তোমারই ইচ্ছা, আমি কিন্তু দিন গণনার নিযুক্ত রহিলাম। ঐ নিরূপিত সময় পর্য্যন্ত আমি অপেক্ষা করিব, যদি তাহার মধ্যে তুমি আসিয়া দেখা না দাও, তাহা হইলে আমি আত্মঘাতে প্রাণত্যাগ করিব। মনে রাখিও, এই স্ত্রীহত্যা-পাপে তোমাকেই লিপ্ত হইতে হইবে।

অন্নপূর্ণা পত্রখানি মুড়িয়া দাসীর হস্তে দিয়া বলিয়া দিলেন,

ধাই মা, আমার অনেক অনুনয়-বিনয় জানাইয়া তাঁদের বোলো যে, আমার স্বামী শ্রীক্ষেত্রে আছেন, তথায় সকলে তাঁকে 'রঘু অরক্ষিত' বলিয়াই জানে। তিনি তথায় দ্বারেদ্বারে ভিক্ষা নাগিয়া জীবন ধারণ করেন। পত্রখানি তাঁহারই হস্তে দিতে হইবে। ধাই মা! তাঁদের হাতে ধরে আরও বোলো যে, তাঁদের অনুগ্রহেই আমি জীবন দান পাইব, আর অনন্তকোটি জীবনেও আমি তাঁদের এ ধন কিছুতেই পরিশোধ করিতে পারিব না, তাঁদের ধনে আমি চির-আবদ্ধ রহিব।

দাসী পত্র লইয়া চলিয়া গেল। তাঁহাদের কাছে গিয়া বিনয়-বচনে সকল কথাই বলিল। তাঁহারাও অন্তর্পূর্ণার দুঃখে দুঃখী; আগ্রহ করিয়াই পত্রখানি লইয়া নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কতকদিন পরে মাঝামাঝের শেষা-শেষি তাঁহারা শ্রীধামে আসিয়া শ্রীপ্রভুর চন্দ্রমুখ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। তাঁহারা একটি বাসা ভাড়া করিয়া কিছু দিন তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভিখারী দেখিলেই তত্ত্ব করেন যে, এই সেই রঘু অরক্ষিত কি না? কিছুদিন যায়, হঠাৎ একদিন সিংহদ্বারের সম্মুখে তাঁহাদের সহিত রঘু অরক্ষিতের দেখা হইল। নাম-ধাম প্রভৃতির পরিচয় লইয়া তাঁহারা বুঝিলেন যে, হাঁ এই ব্যক্তিই অন্তর্পূর্ণার স্বামী রঘুনাথ বটে। তাঁহারা তাঁহাকে বাসায় সঙ্গে করিয়া আনিলেন, আদর পূর্বক মহাপ্রসাদ ভোজন করাইলেন এবং অন্তর্পূর্ণার পত্রখানি তাঁহার হস্তে দান করিলেন। রঘুও পত্রখানি আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়া অতিমাত্র চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। হাত গণিয়া

হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, ফাল্গুন-শুক্লাপঞ্চমীর মাত্র দশটি দিন বাকী আছে । মাসেকের পথ, ইহার মধ্যে যাওয়া যায় কি প্রকারে ? না গেলেও ত বিষম বিপদ ; সতী নিশ্চয়ই আত্মঘাতী হইয়া প্রাণ বিসর্জন করিবে । অহো কি কষ্ট, দুঃস্থ স্ত্রীহত্যা-পাতকে আমার অনন্তকাল নরকঘাতনা ভোগ করিতে হইবে ? হা জগন্নাথ ! ভবের কাণ্ডারী তুমি ভিন্ন এ দুঃস্থর চিন্তার সাগরে কে আমার পার করিয়া দিবে ?

এইরূপ চিন্তার তাড়নার কাতর হইয়া রঘুনাথ তাঁহার চিন্তামণি জগন্নাথের সম্মুখে গমন করিলেন । তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কপালে যুগল কর রাখিয়া বলিতে লাগিলেন,—

“বোইলা—নমো চক্রশাণি । চিন্তার্থিজন-চিন্তামণি ॥  
নমস্তে বাণ্ডাকল্পতরু । রূপাসমুদ্র মহামেরু ॥  
ভূতাকামনা-কামদেহু । ঘোর-বিপত্তি-তম-ভানু ॥  
মোর সঙ্কট নিবারণ । তুমুহু—নাহিঁ অন্য় জন ॥”

সর্কান্তর্যামিন্ ! তুমি তো সকলই জানিতেছ ;—তোমা বই আর আমার কে আছে ? এখন তুমি আমার সহায় স্বপক্ষ না হইলে কে আমার রক্ষা করিবে বল ?

এইরূপ কত কথা বলিয়া-কহিয়া রঘুনাথ তথা হইতে চলিয়া গেলেন এবং সিংহদ্বারের পার্শ্বে একস্থানে ছেঁড়া চট বিছাইয়া শয়ন করিলেন । তিনি মনেমনে শরণাগতবৎসল ভগবানের ভাবনা করিতে-করিতেই ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন । জগন্নাথ তাহা জানিলেন, সেবকের ব্যথার বড়ই ব্যথিত হইয়া পড়িলেন ।

এবং অধিক রাতে বেতালকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন,—বেতাল !  
যাও, শীঘ্র যাও ; সিংহদ্বারে আমার পরম ভক্ত রঘুনাথ শয়ন করিয়া  
রহিয়াছে, তাহাকে শীঘ্র কলাবতীপুরে গঙ্গাধর করণের দ্বারে রাখিয়া  
এস । খুব সাবধানে লইয়া যাইও, দেখো যেন তাহার নিদ্রা ভঙ্গ না  
হয়, কেহ বহিয়া লইয়া যাইতেছে, এ কথা যেন সে জানিতেও না  
পারে । যাও, শীঘ্র যাও, আর বিলম্ব করিও না ।

বেতাল 'তথাস্তু' বলিয়া, তখন তথা হইতে চলিয়া গেল এবং  
রঘুনাথকে মায়াপালকে শয়ন করাইয়া শূন্যপথে 'হ-হ' করিয়া লইয়া  
চলিল । চক্ষের নিমেষ না পড়িতেপড়িতে বেতাল তাঁহাকে কলাবতী-  
পুরে শঙ্করবাটীর দ্বারে শোয়াইয়া রাখিয়া জগবন্ধুর সমীপে ফিরিয়া  
আসিল এবং সকল কথা বলিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া গেল ।

এদিকে সূর্যোদয়ের সঙ্গেসঙ্গেই রঘুনাথের নিদ্রাভঙ্গ হইল ।  
চাহিয়া দেখেন,—এ আবার কোথায় আসিলাম ? কই সিংহদ্বারতো  
দেখিতেছি না ? নীলাচলের অগ্নি কোন স্থান বলিয়াও তো বোধ  
হইতেছে না, এষে অগ্নি কোন দেশে আসিয়াছি দেখিতেছি ? এ  
দেশের নাম কি ? এই সম্মুখের বাড়ীই বা কাহার ? সেখান থেকে  
এখানে আমার আনিলাই বা কে ? এতো বড় বিপরীত ব্যাপারই  
দেখিতেছি ; কাহাকেই বা এসব কথা জিজ্ঞাসা করি ?

রঘুনাথ মনেমনে এইরূপ নানা তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন ।  
বিবাহের পরে আর বড়একটা আশা হয় নাই বলিয়া তিনি চিন্তিতেও  
পারিলেন না যে,—ইহাই আমার শঙ্করবাড়ী । একটু বেলা হইলে  
পথে লোকজনের চলাচলি আরম্ভ হইল । রঘুনাথ একে ওকে



জিজ্ঞাসা করেন,—হাঁগা এদেশের নাম কি ?—সম্মুখে এ প্রকাণ্ড অট্টালিকাই বা কাহার ? সকলেই বলিল—এ কলাবতীপুর ; আর এই বাড়ী গঙ্গাধর করণের । গুনিয়াই রঘুনাথ ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন । তাঁহার নয়ন হইতে দরদর অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল । কেবলই ভাবেন,—এ খেলা তোমারই প্রভু, তোমারই খেলা । আহা আমার দারুণ বেদনা তোমার করুণ হৃদয়ে যাইয়া আঘাত করিয়াছে, তাই তুমি আমার মারা করিয়া এখার পাঠাইয়া দিয়াছ । আহা ঠাকুর ! এই খেলা অস্তুর পক্ষে অসাধ্য হইতে পারে, কিন্তু তোমার আবার এ একটা কার্য্যই বা কি ?

“ব্রহ্মাণ্ড যার খেলঘর । এ কথা কেতেক মাতর ?”

এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড বিরাট-বিগ্রহ তোমার খেলার ঘর বই তো নয় ; ইহাতে তুমি যেখানে-সেখানে খেলার পুতুল আমাদের লইয়া যে খেলা ইচ্ছা সেই খেলাই খেলিতে পার, তাহাতে আর কথাটা কি আছে ?

রঘুনাথ আপনহারা হইয়া প্রভুর উদ্দেশে প্রাণেপ্রাণে এইরূপ কত কি বলিতেছেন, এমন সময় তাঁহার দুই-চারিজন শ্যালক বাটীর বাহিরে আসিলেন এবং দূর হইতেই রঘুনাথকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন । অমনি তাঁহারা তাড়াতাড়ি বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া মাতাপিতা ও অন্যান্য ভ্রাতাকে রঘু অরক্ষিতের আগমনবার্তা জানাইলেন । সকলেই শশব্যস্তে বাটীর বাহিরে আসিয়া দেখেন যে, হাঁ, হেঁড়া নেকড়াপরা সে ই তো বটে । দেখিয়া অল্পপূর্ণার বড় আনন্দ হইল । তিনি মনেমনে ভগবান্কে শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন,

কিন্তু তার আর সকলের মুখ শুকাইয়া গেল, তাঁহারা ভাবেন—এ আপদ আবার কোথা হইতে আসিয়া জুটিল । যাহাই হউক, লোক-লজ্জার খাতিরে সকলে রঘুনাথকে বাটীর মধ্যে ডাকিয়া লইয়া গেলেন এবং ভৃত্যদ্বারা তৈলমর্দন করাইয়া স্নান-মার্জন করাইলেন । দিব্য বসনভূষণে ভূষিত করাও হইয়া গেল । সত্বর ভোজনের আয়োজন হইল । রঘুনাথ জগন্নাথকে অন্ন নিবেদন করিয়া ভোজনে বসিলেন । শ্যালকগণের কৃত্রিম হাস্যপরিহাসের সহিতই আহার শেষ হইয়া গেল । শ্বশুর শাশুড়ী ও শ্যালকগণ হৃদয়ে হলাহল রাখিয়া রঘুর চারিদিক্ ঘেরিয়া বসিয়া মুখে মিষ্টকথার অমৃতবর্ষণ করিতে লাগিলেন । জামাই-আদরের যেন আর সীমা পরিসীমা নাই । কিছুক্ষণ পরে ‘একটু বিশ্রাম কর’ বলিয়া সকলে চলিয়া গেলেন ।

রঘুনাথ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিলেন । ব্রীড়াবনতা পতিব্রতা অন্নপূর্ণা ধীরে-ধীরে আসিয়া পতির পদতলে বসিলেন এবং কোমল-করে মৃদুমৃদু পাদসংবাহন করিতে লাগিলেন । কত কথাই সতীর মনে আসিল, কত কথাই বলিব-বলিব মনে হইল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া একটি কথাও বাহির হইল না, মনেই সকল কথা লয় পাইয়া গেল । রঘুনাথের দশাও ঠিক তাহাই হইল ; তিনিও তাঁহাকে একটি কথাও কহিতে পারিলেন না । তবে কি ছুজনে কোন কথাই হইল না ? হইল বই কি । কথা হইল, ছলছল নেত্রের কলকল ভাষায় । দুইজনেরই পলকহীন নয়ন দিয়া প্রেমের জল গড়াইয়া পড়িল ;—দুইজনেরই তাপিত প্রাণ শীতল হইয়া গেল ।

এদিকে নীরবতার সুরবাহারে অশ্রুরেখার কোমল তারে

দম্পতীর মিলনগীতির আলাপ হইতে থাকিল, ওদিকে পিশাচপ্রকৃতি করণপরিবার নয়টি জিহ্বাবস্ত্র একসুরে বাঁধিয়া দম্পতীর চিরবিচ্ছেদের বজ্রবাগিনীর আলাপ জুড়িয়া দিলেন। এক নিভৃত কক্ষে বসিয়া গঙ্গাধর, তাঁহার স্ত্রী ও সপ্ত পুত্র পরামর্শ আটলেন, আজই রাতে বিষপ্রয়োগে রঘুনাথের প্রাণসংহার করিতে হইবে। অন্নপূর্ণার জন্তু তো কিছু ভাবনা নাই, রঘুনাথ মরিলে সে তো আর অনাথা হইতেছে না? নস্থিপুত্রের সহিত বিবাহ হইলেই তাহার সুখসম্পদ যোল কলার পরিপূর্ণ হইবে।

যেমন পরামর্শ অমনি কাজ। গোপনে-গোপনে বিষ সংগ্রহ করা হইল। বন্দোবস্ত হইল,—খাণ্ডদ্রব্যে বিষ মিশাইতে হইবে। সন্ধ্যা হইল। আহাৰ্য্য প্রস্তুতেরও আয়োজন হইতে লাগিল। পাপাশয়া গঙ্গাধর-জামাই বিষ মিশাইয়া-মিশাইয়া অন্নব্যঞ্জন পিষ্টক-পায়সাদি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। মাতাপিতা ও ভ্রাতার গুপ্ত পরামর্শ ও চুপিচুপি কথাবার্তায় চতুরা অন্নপূর্ণার মনে কেমন সন্দেহ জন্মিল। তিনি রন্ধনকার্য্যে জননার সাহায্য করিবার অছিলায় রন্ধনশালার আসিলেন। মাতা অমনি বলিয়া উঠিলেন,—না মা, আজ আর তোমার কাজকর্ম্ম কিছুই করিবার দরকার নাই, কতদিনের পর জামাই এসেছেন, যাও না তাঁহারই সেবা করগে। মাতার বারংবার নিষেধ সত্ত্বেও অন্নপূর্ণা “একটু থাকি একটু থাকি” বলিয়া তথা হইতে নড়িলেন না। ব্যাপার বৃদ্ধিতে তাঁহার বড় বিলম্বও হইল না। বুদ্ধিমতী আঁচে-ওঁচেই সকল ব্যাপার বৃদ্ধিয়া ফেলিলেন। দুৰন্ত চিন্তায় তাঁহার হৃদয় দুৰুচুৰু কাঁপিতে লাগিল।

ভাবিলেন, যাই, পতির কাছে সকল কথা বলিয়া সাবধান করিয়া দিই । তথা হইতে যাইবার জন্ত তাঁহাকে আর কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে হইল না । মাতার ঘনবন অনুরোধেই তাঁহাকে সে স্থান ত্যাগ করিতে হইল । গৃহে আসিয়া দেখেন, পতি বাহিরবাটীতে গিয়াছেন । অন্তর্পুর্ণার বড় চিন্তা হইল, এখন করা যায় কি, কি উপায়ে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিই ? কি প্রকারেই বা তাঁহার জীবন রক্ষা করি ?

অনেকক্ষণ চিন্তার পর অন্তর্পুর্ণা স্থির করিলেন, এক কার্য্য করা যাউক, একখানি পত্র লিখি, কোন সুযোগে সেখানি পিষ্টকের মধ্যে রাখিয়া দিই । শশুরবাড়ী থাকিবার সময় দেখিয়াছি, তিনি পিষ্টক বড় ভালবাসেন । অগ্রে পিষ্টক খাইতে গেলেই পত্রখানি তাঁহার নজরে পড়িবে, আর অমনি তিনি সাবধান হইয়া যাইবেন ; বিষ-মিশ্রিত অন্ন আর ভোজনই করিবেন না । অন্তর্পুর্ণা তাহাই করিলেন, শ্রীহার স্মরণ করিয়া এক টুকরা তালপত্রে মাত্র দুইটী ছত্র লিখিলেন,—

“বিষ যে ভরিচ্ছন্তি এথে । ভুঞ্জিব নাহি কদাচিত্তে ॥”

তার পর তিনি তাড়াতাড়ি রন্ধনশালায় গিয়া দেখেন যে, রন্ধনের কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে, স্তবর্ণপাত্রে সকল খাদ্য সাজানো হইতেছে । সাজানোও শেষ হইয়া গেল । অন্তর্পুর্ণার মাতা বলিলেন,—“মা অনো ! একটু দাঁড়াও তো মা, ঘরের ভিতর আহারের স্থান হইয়াছে, আমি সেখানে কতক কতক রাখিয়া আসি ।” অন্তর্পুর্ণাও তাই চায় । মা-ও কতক খাবার লইয়া চলিয়া গেলেন, অন্ত-

পূর্ণাও ক্ষিপ্রহস্তে পিষ্টকপাত্রে উপস্থিত পিষ্টকের মধ্যে তালপত্র-টুকু পুরিয়া দিলেন ।

অন্নপূর্ণার মাতা খাবার-দাবার পরিবেষণ করিয়া পরিচারিকার দ্বারা রঘুনাথকে অন্তরে ডাকাইলেন এবং আহারের জন্তু জরুরোধ করিলেন । পাণীয়সীর ভিতরটা জামাতার মৃত্যুকামনায় পূর্ণা থাকিলেও মুখে যেন আদর আর ধরে না । রঘুনাথ এত ব্যাপার কিছুই জানেন না, তিনি পাদপ্রক্ষালন করিয়া আসনে বসিলেন এবং আনন্দমনে অন্নব্যাঞ্জনাদি সমস্তই জগন্নাথকে নিবেদন করিয়া দিলেন । আচমনের জলও হস্তে গ্রহণ করিলেন । অন্নপূর্ণা দূর হইতে তাহা দেখিতেছেন, আর তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া-কাঁপিয়া উঠিতেছে । তিনি একবার ভাবেন—হায় যদি তিনি অগ্রে পিষ্টকটি না-ই গ্রহণ করেন, তাহা হইলে কি হইবে ? আবার ভাবেন, যা থাকে কপালে, ধাইয়া গিয়া পতিকে বলিয়া আসি, ওগো, ওসব কিছু খেওনা গো খেওনা, —সকল খাবার বিধে ভরা গো বিধে ভরা ।

ভগবানেরই খেলা, অন্নপূর্ণাকে আর অধিক ভাবিতে হইল না, রঘুনাথ আচমন করিয়া সর্বাগ্রে সেই পিষ্টকটিই হস্তে ধারণ করিলেন । পিষ্টকটি ভাঙ্গিবামাত্র তাহার ভিতর হইতে তালপত্রের টুকরাট পড়িয়া গেল । ছোট একটু তালপাতা বই তো নয়, অথচ তাহা বড় একটা দেখিতে পাইলেন না । দেখিলেন কেবল রঘুনাথ এবং অন্নপূর্ণা । রঘুনাথ লেখাটুকু পড়িয়া সকল ব্যাপার বুদ্ধিতে পরিলেন । এদিকে ভোজন আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া অন্নপূর্ণার জননী কৌশল করিয়া কণ্ঠকে তথা হইতে সরাইয়া দিলেন । বলিলেন,—

মা অনো ! তুমি ততক্ষণ ধাইমার কাছে গিয়া গল্প করগে, আমি ডাকিয়া আনিব এখন । যাও মা ! যাও । মনের ভাব,—‘ও এখানে থাকিলে হয় তো কোন গোলযোগ বাধিতে পারে, আর গল্প করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়ে তো সকল লেঠাই চুকিয়া গেল ।’ অন্তর্পূর্ণাও যাইতে কোন আপত্তি করিলেন না, কেন না, তাঁহার বিশ্বাস, স্বামী যখন পত্র পাইয়াছেন, তখন আর ঐ বিষমাখানো খাবার কিছুতেই আহাৰ করিতেছেন না, তাঁহার জীবনের জন্ত সার ভাবনা নাই ।

রঘুনাথ কিন্তু বিষম সমস্তাতেই পড়িয়া গেলেন । তাঁহার হাতের পিঠা হাতেই রহিল । তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—হার, আমি করি-  
লাম কি ? আমার প্রভুকে আমি বিষ ভোজন করাইলাম ? হা  
প্রভু ! আমার এ অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর নাথ, ক্ষমা কর ।  
এখন বুদ্ধি দাও ঠাকুর ! আমি কি করি ?

“বুদ্ধি যে ন দিশই মোতে । প্রসাদ ছাড়িবি কেমনে ॥  
জনম হোইলে নিয়ত । অবশ্য মরিবার সত ॥  
যেবে প্রসাদ ছাড়ি দেবি । কালে কি অমর হোইবি ? ॥  
কেবল প্রভু-অপরাধে । পড়িবি মহা নরক মধ্যে ॥”

হা নাথ ! কোন বুদ্ধিই যে আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না ?  
আনি তোমার প্রসাদই বা ছাড়ি কি প্রকারে ? যখন জন্ম লাভ  
করিতে হইয়াছে, তখন অবশ্যই একদিন মরিভেও হইবে, আর এই  
প্রসাদ পরিত্যাগ করিলেই কি অমর হইয়া যাইব, তাওতো নয় ।  
বরং লাভের মধ্যে ইহাই হইবে যে, প্রভু ! তোমার কাছে মহা অপ-  
রাধেই পতিত হইতে হইবে এবং সেই অপরাধে ছরন্ত নরক মধ্যে

ঘাইয়া পড়িব । ইহাতে আমার লাভই বা কি হইবে ? না না, প্রসাদ আমি কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিব না, তা প্রাণ থাকুক আর যাউক ।

রঘুনাথ পিষ্টকহস্তে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন । স্বাশুড়ী রাক্ষসী মনে করিতে লাগিলেন, জানাতা বড় ভগবদ্ভক্ত, তাই বুঝি ভোজনের পূর্বে ভগবানকেই ভাবিতেছেন ? রঘুনাথ জানিয়া-শুনিয়াও অবিচলিতচিত্তে সেই বিষমিশ্রিত অন্ন গোবিন্দ স্মরণ করিতে-করিতে ভোজন করিলেন, বেণুপ্রমাণও অবশিষ্ট রাখিলেন না । দেখিতে-দেখিতে বিষ তাঁহার সর্ব শরীর ঘিরিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে গিয়া চড়িল । আর রক্ষা নাই, রঘুনাথ অমনি অচেতন হইয়া ধরার ঢলিয়া পড়িলেন এবং যাতনায় ছটকট করিতে-করিতে ইহলীলা সংবরণ করিলেন । দেখিয়া গঙ্গাধররমণী আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন, তাড়াতাড়ি স্বামী ও পুত্রকে ডাকিয়া আনিলেন । তাঁহাদের আনন্দই বা দেখে কে ? সকলে মিলিয়া পরানর্শ আটিলেন, রাত্রি প্রভাত হইলেই ইহাকে মাটির ভিতর পুঁতিয়া ফেলিব এখন । কেহ জিজ্ঞাসা করে তো বলা যাইবে, কল্যা রাত্রে সর্পাঘাতে ইহার মৃত্যু হইয়াছে । এই বলিয়া সেই ঘরের কপাট বন্ধ করিয়া দিয়া সকলে চলিয়া গেলেন ।

অনপূর্ণা মায়ের কথায় চলিয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তরে শান্তি নাই ; প্রাণ যেন সদাই হারাই হারাই করিতেছে । পতির কোলে বিষমিশ্রিত অন্ন দেখিয়া কোন্ পতিরতার প্রাণ শান্ত থাকিতে পারে বল ? তিনি কেবল কাতরভাবে শয়নগৃহের এদিক্

ওদিক করিতেছিলেন । মাতা পিতা ও ভ্রাতার ফিস্ফাস্ কথা বলা এবং পা টিপে-টিপে চলা-বুলার ধরণ দেখে তাঁহার প্রাণে সন্দেহ আরও জাগিয়া উঠিল, সকলে চলিয়া গেলে তিনি শয়ন-গৃহের বাহিরে আসিলেন । আন্তেআন্তে ভোজন-গৃহের দ্বারে গমন করিলেন । গৃহে প্রদীপ জ্বলিতেছিল, সেই আলোকে দ্বারের কাঁক দিয়া দেখিলেন, তাঁহার জীবনধন ভোজনের আসনের উপর জীবনহারা হইয়া পড়িয়া আছেন । দেখিয়া সতীর শরীরখেরখর কাপিতে লাগিল, তিনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না, সেইখানেই মূচ্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেলেন । মূচ্ছা ভঙ্গ হইলে চাহিয়া দেখেন, তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকারের মত চারিদিকেই সূচীভেদ্য অন্ধকার । দ্বারের অবকাশ দিয়া আবার দেখিতে গেলেন, দেখিলেন গৃহের দীপও নিবিয়া গিয়াছে, সেখানেও জমাটবাঁধা অন্ধকার । অন্তরে ঘরে-বাহিরে সর্বত্রই অন্ধকারের রাজত্ব । এ অবস্থায় সতী কি করেন ; তিনি তাঁহার প্রাণের হরিকেই প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে লাগিলেন । ভেরীর নিনাদ এক যোজন মাত্র যায়, বজ্রের ধ্বনি দ্বাদশ যোজন মাত্র গমন করিতে পারে, কিন্তু ভক্তের অন্তরের শব্দ মুহূর্ত্তমধ্যে বিশ্ব-ত্রুক্ষাও ব্যাপিয়া ফেলে । হরিপরায়াণা অন্নপূর্ণার অন্তরের কথা দেখিতে-দেখিতে বিশ্বব্যোম ভেদ করিয়া ভগ্নবন্ধামে চলিয়া গেল । প্রভুর রত্নসিংহাসন অমনি খরখর কাঁপিয়া উঠিল । ভক্তের হৃদয়ের বাথা ব্যথাহারী হরির হৃদয়ে বাইয়া দারুণ আঘাত করিল ; ভক্ত স্বপ্নাণের বিবন বিপত্তি বুঝিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বিছাদ-গতিতে কলাবতীপুরে গমন করিলেন । অকস্মাৎ ঘরের ভিতর হইতে



যেন কিসের শব্দ অন্নপূর্ণার কাণে আসিয়া বাজিল । ব্যস্তসমস্তভাবে তিনি দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখেন, দ্বারের ফাঁক দিয়া স্নিগ্ধ উজ্জ্বল আলোক বাহির হইয়া পড়িতেছে । তাড়াতাড়ি সেই ফাঁক দিয়া দেখেন যে, ঘরের কালো আঁধার ভেদ করিয়া কালো মাণিক জলিয়া উঠিয়াছে ! আহা তাঁহার প্রাণের হরি তাঁহার প্রাণের পতিকে কোলে লইয়া স্নেহময় জনকজননীর মত সর্বাঙ্গে পদ্মহস্ত বুলাইতেছেন, আর বলিতেছেন,—

“বোইলে—উঠ রে নন্দন । কিপী তু নিদ্রে অচেতন ॥  
যাহা সহায় পীতবাস । তার গরল ছার কিম ?”

ওরে আনার নয়নানন্দ রঘুনাথ ! উঠে বোস্ বাছা উঠে বোস্ ।  
তুই নিদ্রায় অচেতন বহিয়াছিস্ কেন ? এই দেখ্ বাছা আমি এসেছি ।  
আমি যাহার সহায়, তুচ্ছ বিষ তাহার কি করিতে পারে ?  
উঠে বোস্ বাছা উঠে বোস্ ।

জগজ্জীবনের সঞ্জীবন মস্ত্রে মৃত রঘুনাথ পুনর্জীবন পাইলেন ।  
ঘুমন্ত রঘুনাথ যেন জাগরিত হইলেন । সঙ্গেসঙ্গে সেই আলোকও  
অদৃশ্য হইয়া গেল । অন্নপূর্ণা অন্ধকারে আব কিছুই দেখিতে  
পাইলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকার চিবতরে দূর হইয়া  
গেল । আলোকভরা আনন্দপোরা হৃদয় লইয়াই তিনি শয়নগৃহে  
ফিরিয়া আসিলেন ।

খুব গাঢ় নিদ্রার পর জাগরিত হইলে যেমন মনে হয়,—বড়  
সুখেই ঘুমাইয়াছি, কিছুই জানিতে পারি নাই ; রঘুনাথের অবস্থাটাও  
এখন ঠিক তেমনই । তাঁহারও মনে হইতে লাগিল—বাব, থানা

ঘুমাইয়েছিলাম, কে আমার আনন্দনিদ্রা ভাঙাইয়া দিলরে ? তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন । এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখেন, কোথাও কেহ নাই, কেবল ঘুটঘুটে আঁধারে ঘরদ্বার ভরিয়া রহিয়াছে । ক্ষণ-পরেই তাঁহার পূর্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল ; ভাবিলেন,—তাইতো আমি সেই রঘুনাথ না ? বিষভোজনে আমি না মরণাপন্ন হইয়াছিলাম ? হাঁ হাঁ তাইতো বটে, তাইতো বটে । ওঃ কি অসহ্য যাতনা, কি বিষম দাহ জ্বালা । মনে হইলে এখনও মুচ্ছিত হইতে হয় । হায়, সে জ্বালা আমার কে জুড়াইয়া দিল ?—কে আমার প্রাণহীন শরীরে প্রাণের সঞ্চার করিয়া দিল ? প্রাণনাথ ! তুমি ?—তুমিই কি ? তুমি না হইলে ভূতোর প্রতি এত করুণা কাহার হইবে করুণাময় ? হা প্রভু ! তোমার খেলা তুমিই ভাল বুঝ ; কোন হইতে আছাড় দিয়া ফেলিয়া দিতেও তুমি, আবার আদর করিয়া বুকে লইয়া মুখ চুমিতেও তুমি । তোমার এ লীলারহস্য অজ্ঞ মানব আমরা কি বুঝিব প্রভু ! বুঝিবারই বা দরকার ? দাও দাও নাথ !—ব্যথা দাও ব্যথা দাও, নিত্য নূতন নূতন ব্যথা দাও ব্যথা দাও, আমি মাথা পাতিয়াই লইব । প্রতি কথার পশ্চাতে পশ্চাতে তোমার মমতা-মাথানো ব্যথা-জুড়ানো মূর্তি তো দেখিতে পাইব ! তাহা হইলেই হইল । তাহাই আমার পরম লাভ,—পরম শান্তি । দাও দাও নাথ ! ব্যথা দাও ব্যথা দাও ।

ভক্ত রঘুনাথ তাঁহার ব্যথাহারী হরির উদ্দেশে এইরূপ কত কথাই বলিলেন,—কত হাসিলেন-কাদিলেন, তার পর গদগদ স্বরে 'রায় কৃষ্ণ হরি' প্রভৃতি নাম কীর্তন করিতে লাগিলেন । নামের

নেশায় রঘুনাথের বাহু জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গেল । দেখিতে-দেখিতে রাত্রিও শেষ হইয়া আসিল । পাপপ্রকৃতি করণপরিবারের আর নিদ্রা নাই । সারা রাত্রি বিছানার পাড়িয়া সকলেই এপাশ ওপাশ করিতেছিলেন । রঘুনাথের বিষজ্বালার অপেক্ষা ইহাদের হৃদয়ের জ্বালা বোধ হয় আরও বেশী । বাহাকে যাতনা দেওয়া যায়, তাহার অপেক্ষা, যাহারা যাতনা দিবার মতলব আঁটে, তাহাদের যাতনা যে অনেকগুণে অধিক । রঘুনাথ বিবে অচেতন হইয়া পড়িলেন, তাঁহার জ্বালা আর তিনি জানিতেও পারিলেন না, কিন্তু গঙ্গাধর করণ, তাঁহার পত্নী ও পুত্রাদি কাল্পনিক চিন্তার জ্বালায় অধীর হইয়া পড়িলেন । ঐ কে বুঝি আমাদের আচরণ জানিয়া ফেলিল, ঐ কে বুঝি রাজদরবারে যাইয়া আমাদের কথা বলিয়া দিল, ঐ বুঝি আমাদের ধরিয়া লইয়া যাইবার জন্ত সেপাই-সাম্রী প্রেরিত হইল ; ইত্যাদি কত চিন্তাই তাঁহাদের হৃদয় জর্জরিত করিয়া ফেলিল । তাঁহারা একবার উঠেন একবার বসেন, এক-একবার জানালা দিয়া রাত্রি পোহাইল কিনা উকি মারিয়া দেখেন ; কিন্তু রাত্রি আর প্রভাত হয় না ;—সে যেন বাড়িয়া-বাড়িয়াই চলিয়াছে । এইবার অরুণ-আলোক দেখিয়া সকলেই তাঁহারা শব্দা ত্যাগ করিলেন এবং একত্রিত হইয়া শব লইয়া যাওয়া কিংবা মাটির মধ্যে পুঁতিয়া ফেলা প্রভৃতির বন্দোবস্ত করিয়া ভোজনগৃহের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । নরাদম গঙ্গাধরই তাড়াতাড়ি গিয়া দ্বার উদ্বাটন করিলেন । তখন প্রভাত হইয়া গিয়াছে, সূর্যালোকে গৃহ-মধ্য উদ্ভাসিত হইয়াছে ; সেই সুস্পষ্ট আলোকে তাঁহারা যাহা দেখি-

লেন, তাহাতে সহজে বিশ্বাসস্থাপন করা যায় না। তাহারা দেখিলেন,—রঘুনাথ ভোজনের আসনের উপর স্থির ধীরভাবে রসিয়া আছেন, তাঁহার সকল শরীর পুলকে পূর্ণ, বদনে দিব্য-জ্যোতি, নিশ্চলনয়নে জলধারা, ওষ্ঠাধর প্রকম্পিত, বিলম্বে বিলম্বে রসনায় অক্ষুট রাম কৃষ্ণ হরি নাম উচ্চারিত। তিনি যেন এখানে থাকিয়াও এখানে নাই,—এ লোক ছাড়িয়া আর কোন্ লোকে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলে, বিশ্বয়সাগরে ডুবিয়া গেলেন। ভাবেন—এ আবার কি বিচিত্র ব্যাপার! কাহারও মুখে কথাটি নাই। সকলে গৃহের ভিতর গমন করিলেন। তখনও রঘুনাথ অচল অটল। তাঁহাদের পদশব্দে ভাববিভোর রঘুনাথ যেন আর কাহার পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন। অমনি তিনি ছুই বাত প্রসারিয়া—‘এস এস প্রভু!’ বলিয়া আনু-থালু-ভাবে উঠিয়া দাড়াইলেন। নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখেন, কই কোথায় প্রভু; হরিহরি এ যে তাঁহারই হস্তারক স্বপুত্র স্বাশুড়ী ও শ্যালকগণ!

মাতালের মত টলিতে-টলিতে রঘুনাথ আবার সেই আসনেই রসিয়া পড়িলেন। তখন গঙ্গাধর প্রভৃতির মাথায় টনক নড়িল। তাঁহারা ভাবিলেন,—এ তো বড় ছোটখাট লোক নয় দেখিতেছি। এত বিষ খাইয়াও কি মানুষ বাচে? এ বুঝি কোন দেবতাই হইবে? ভয়ে-বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া তাঁহারা রঘুনাথের শরণাগত হইলেন এবং বিনয়বাক্যে ক্রমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। রঘুনাথও হাস্ত-শ্রবণ বদনে বলিলেন,—

“ভুক্তর কিচ্ছি নাহি” দোষ। পূর্বে কাহাকু দেলি বিধী।

তেই এ জনে কলি পান । অর্জিলা কথা নোহে আন ॥”

ইহাতে আপনাদের কিছুই দোষ নাই দোষ নাই ; আমি বোধ হয় পূর্বজন্মে কাহাকেও বিষ দান করিয়াছিলাম, তাই এ জনে আনাকে সেই বিষ পান করিতে হইল । পূর্বজন্মকৃত কর্মের ফল তো অগ্ৰথা হইবার নয় ; অবশ্যই তাহা ভোগ করিতে হইবে । তবে বিষ ভোজনেও যে আমি প্রাণ পাইলাম, সে কেবল আমার প্রাণপতি দারুব্রহ্মমূর্তি ছিলেন বলিয়া । এখন আপনাদের কাছে আমার একটা নিবেদন আছে ;—আপনারা আমার দারিজ্য দেখিয়া আপনাদের কণ্ঠা অগ্ৰে করে অর্পণ করিতে সক্ষম করিয়াছেন ; ভাল তাহাই হউক, আমায় দয়া করুন, আমি আসি ; কিন্তু আর একটা কথাও বলি, যদি আপনাদের ধর্মের ভয় থাকে, তবে আমার পত্নী আমাকেই দান করুন, সে আমার ছুঃখীর সঙ্গিনী, তাহাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া যাই । দেওয়া না-দেওয়া অবশ্য আপনাদেরই ইচ্ছা, ইহাতে আমার কোন জিদ-জবরদস্তি নাই ।

এই কথা বলিয়া রঘুনাথ উচ্চস্বরে মুকুন্দ মাধব মুরারি প্রভৃতি ভগবন্নাম কীর্তন করিতে-করিতে গৃহের বাহির হইয়া পড়িলেন । দেখিতে-দেখিতে রঘুনাথ একবারে রাস্তায় হাজির । সপ্ত পুত্রসহ গঙ্গাধরও পাছুপাছু ধাইয়া গিয়া তাঁহাকে ধরিলেন । বলিলেন, আজিকার দিনটা এখানে থাক, কল্য তোমার পত্নীকে তুমি সমভিন্যাহারে লইয়া যাইও, কোন আপত্তিই করিব না । রঘুনাথ কিন্তু আর সেই পাপ-পুরীতে কিছুতেই প্রবেশ করিলেন না, এক বৃক্ষমূলে যাইয়া বসিয়া রহিলেন ।

গঙ্গাধর করেন কি, 'আচ্ছা আমি এখনই আসিতেছি' বলিয়া পুত্রসহ ঘাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। এদিকে অন্নপূর্ণা পিঞ্জর-রুদ্রা পক্ষিণীর গায় গৃহমধ্যে ছটফট করিতেছিলেন; প্রভাতের ব্যাপার তিনি কিছুই জানেন না। হতভাগ্য পিতা ও ভ্রাতারা রাত্রি প্রভাত হইতে-না-হইতে তাঁহার শয়নগৃহের দ্বার চাবি দিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। গঙ্গাধর গৃহিণী ও পুত্রগণকে সঙ্গে লইয়া অন্নপূর্ণার শয়নগৃহের দ্বার উদ্বাটন করিলেন এবং গৃহমধ্যে গমন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বল্ অন্নপূর্ণা ! বল, তুই তোর কাঙ্গাল স্বামীর সঙ্গে যাইতে চাহিস্ ; না আমাদের কাছে থাকিতে ইচ্ছা করিস্ ?

অন্নপূর্ণা লজ্জাজড়িত কণ্ঠে কিন্তু দৃঢ়তার সহিতই বলিয়া উঠিলেন,—পিতা ! আমার অপরাধ মার্জনা করুন, আমি আমার পতির সহিতই গমন করিব। কাঙাল হউন, ভিখারী হউন, বাহাই হউন, আমি তাঁহারই গলে বরমালা অর্পণ করিয়াছি, তিনিই আমার একমাত্র গতি। পতির কথা বলিতে-বলিতে পতিরত্নতার লজ্জার বাধ ভাঙ্গিয়া গেল। অন্নপূর্ণা সিংহিনীর মত গর্জিয়া উঠিলেন। তাঁহার ময়নে দপদপ অনল জ্বলিয়া উঠিল। অন্নপূর্ণা বেন আর সে অন্নপূর্ণা নাই, দানব-দলনীর মত তিনি সেই দুষ্ট দানব-দলকে নেত্রানলে ভস্ম করিতে উত্তত হইলেন। কঠোর কর্কশ স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—পিতা পিতা ! তোমরা আনন্স বিচারিণী করিতে চাও ?—পতিকে বঞ্চিত করিয়া পরপুরুষের করে অর্পণ করিতে চাও ? পারিবে না, পারিবে না ; আমি তেমন মেয়ে নই,—আমি সতী ; কোন থাকিতে

আমায় তাহা পারিবে না পারিবে না । নিশ্চয় জানিও, তাহা হইলে আমি আত্মঘাতিনী হইব । সতীর অভিশাপে তোমার মাধের সংসার ছারেধারে যাইবে ।

জলের উত্তাপ কতক্ষণ থাকে ? শৈত্যগুণই যে তাহার স্বাভাবিক ধর্ম । সরলা অন্তর্পূর্ণার কোপও অধিকক্ষণ রহিল না । তিনি আবার পিতার চরণ ধারণ করিয়া কাতর-কোমল-কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—ক্ষমা করুন পিতা ! ক্ষমা করুন । আমার পতির সহিত আমাকে যাইতে দিন ।

“মুঁ যোগী সে মোহর খাল । মোতে রাখিলে অমঙ্গল ॥”

দেখুন, আমি যেন যোগী, আর পতি হইতেছেন আমার ভিক্ষাপাত্র, তিনিই আমার একমাত্র সম্বল । আমাকে এখানে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে আপনার মঙ্গল নাই জানিবেন । তাই মিনতি করিয়া বলি, আমাকে আমার পতির সহিত যাইতেই অনুমতি দান করুন ।

গঙ্গাধর তাঁহার পত্নী ও পুত্রগণ একে রঘুনাথের প্রভাব দর্শনে ভীত-ভীত ছিলেন, তাহার উপর অন্তর্পূর্ণার অবস্থা দেখিয়া আরও অধিক ভীতচিন্তিত হইয়া পড়িলেন । অবশেষে অনেক পরামর্শের পর সকলেই স্থির করিলেন যে, রঘুনাথের সহিতই অন্তর্পূর্ণাকে যাইতে দেওয়া হউক । তখনই অন্তর্পূর্ণাকে সাজানোগোজানো হইল । গঙ্গাধর স্বয়ং ধনরত্নসহ কণ্ঠার করে ধরিয়া রঘুনাথের সমীপে লইয়া গেলেন এবং বিনয়বচনে বলিলেন,—নাও বাবা ! তোমার পত্নী তুমি গ্রহণ কর । আর আমাদের প্রতি দয়া করিয়া

বাও, যেন কোন অমঙ্গল না হয়। তবে একটা বড় দুঃখ রহিল, বাপ-মা থাকিতে-থাকিতে বাছার আন্নার সংসার-লজ্জা কিছুই রাখিলে না।

বলিতে-বলিতে বাষ্পবেগে গঙ্গাধরের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। তিনি অশ্রুবর্ষণ করিতে-করিতে রঘুনাথের করেকরে অন্নপূর্ণাকে সমর্পণ করিয়া দিলেন এতং বলিলেন,—ধাঝা ! এই নাও তোমার পত্নী নাও, আন্নার অন্নপূর্ণা আজ হইতে তোমার হইল— আজ হইতে ইহার সকল ভার তোমার উপর পড়িল। বলিয়া তিনি কাঁদিতে-কাঁদিতে চলিয়া গেলেন।

অন্নপূর্ণাও পতির চরণতলে পতিত হইয়া একান্তভাবে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। উঠিয়া কপালে হাত দুইটা রাখিয়া বলিলেন,—প্রাণনাথ ! এখানে আর একটুও বিলম্ব করিবেন না, কোথায় যাইবার ইচ্ছা চলুন, দাসী আপনার অনুগমন করিতে প্রস্তুত। রঘুনাথও প্রীতিভরে পত্নীর হস্তধারণ করিয়া ‘জয় জগন্নাথ’ বলিয়া নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তাঁহারা দুইজনে চলিলেন। গঙ্গাধর-প্রেরিত কয়েকজন দাস-দাসীও তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিল। রঘুনাথের বারংবার মিষেখে অনেকেই ফিরিয়া গেল বটে ; ফিরিল না কেবল অন্নপূর্ণার সেই ধাই-মা, আর বাছারা আশৈশব অন্নপূর্ণাকে বড় ভালবাসে, এইরূপ দুই-চারিজন দাসদাসী। তাহাদের সহিত কড়ার হইল যে, তাহারা বরাবর সঙ্গে যাইতে পাইবে না, গ্রামের দীঘা পার করিয়া দিয়াই ফিরিয়া আসিবে।



গঙ্গাধর বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন । অন্তর্পূর্ণাকে বিদায় দিয়া তাহার প্রাণে আজ একটুও শান্তি নাই । তিনি বিবর্ণ-মনে অস্তঃ-পুরে পত্নীসমীপে গমন করিলেন । একটি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন,—হায় আমার সাধের অন্তর্পূর্ণা ভিখারীর করে তুলিয়া দিয়া আসিলাম । তিনি আর অধিক কিছু বলিতে পারিলেন না, সেইখানেই বসিয়া-বসিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন ।

অন্তর্পূর্ণার পাষণ্ডী জননী প্রাণ কিস্তি কিছুতেই গলিবার নয় ; মাগীর বড়ই দুঃখ যে, সে অত করে বিষ মিশারে খাবারদাবার প্রস্তুত করিল,—সকাল বেলা কি কি বোলে কেঁদে কেঁদে পাড়া মাং করে দেবে, সারা রাত জেগে জেগে তার একটা প্রকাণ্ড পালা কাঁদিল ; আর ফুল মন্দের চোটে তাহার সকল চেঁচাই ব্যর্থ হইয়া গেল ! হায় হায়, এ দুঃখ রাখিবার কি আর স্থান আছে ? তাই তিনি অন্তর্পূর্ণার বিদায়কালে একটুও বিচলিত হন নাই । দুইটা মিষ্ট কথা বলিয়াও অন্তর্পূর্ণাকে আশ্বস্ত করেন নাই ; আর এখন পতির মুখে তাহার বিদায়বাণী শুনিয়াও তিনি একটুও বিচলিত হইলেন না, পতির বেদনায় সমবেদনা জানাইলেন না । বরং উত্তেজনার স্বরে পতিকে বলিয়া উঠিলেন,—বসিয়া-বসিয়া কাঁদবার সময় এ নয় ; এখন যাও সেই মন্ত্রিপুত্রের কাছে সঘর এই সমাচার পাঠাইবার ব্যবস্থা করগে ; এখনও সময় আছে—চেষ্টা করিলে এখনও অন্তর্পূর্ণার উদ্ধার হইলেও হইতে পারে ; যাও, শীঘ্র যাও, মন্ত্রিপুত্রের নিকটে দূত পাঠাইতে আর কালবিলম্ব করিও না ।

শৈশব গঙ্গাধর স্ত্রীর আদেশ অমান্য করিতে পারিলেন না ; সঘর

বহির্বাটীতে আসিয়া দূতপ্রেরণের বন্দোবস্ত করিলেন । একখানি পত্র লিখিয়া দূতের হস্তে দেওয়া হইল । দূতও দ্রুতগতি মস্তিভবনে চলিয়া গেল । মন্ত্রিপুত্রের অগ্রে গিয়া প্রণামপূর্বক বলিল,—“হুজুর, আমি মহানুভব গঙ্গাধর করণের দূত, তাঁহার এই পত্র গ্রহণ করিতে আজ্ঞা হয় ।” মন্ত্রিপুত্র মহা আগ্রহসহকারে দূতের হস্ত হইতে পত্রখানি লইয়া পাঠ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িলেন । সিংহ-গর্জনে বলিয়া উঠিলেন,—কি, এত বড় স্পর্ধা, শৃগাল হইয়া সিংহের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া যাইবে ? তাহা কখনই হইবে না । দূত ! তুমি যাও, তাঁহাকে আমার অভিবাদন জানাইয়া বলিও যে, তাঁহাদের চেষ্ঠা ব্যর্থ হইয়াছে বটে, কিন্তু আমার চেষ্ঠা কিছুতেই ব্যর্থ হইবার নয় । এই সসৈন্তে যাত্রা করিলাম, এখনই সেই চোরের উপযুক্ত শাস্তি দিয়া অনপূর্ণাকে উদ্ধার করিয়া আনিতেছি । এই পথেই তো আছে, পলাইবে কোথায় ?

দূত চলিয়া গেল । এদিকেও সাজ-সাজ রবের মহা সাদা পড়িয়া গেল । মন্ত্রিপুত্র বণসাজে সাজিয়া সসৈন্তে যাত্রা করিলেন । সকলেই অস্বাভাবিক । পবনবেগে অশ্ব নকল ছুটিল । তাহাদের খুরোখিত ধূলিতে চারিদিক অন্ধকার হইয়া পড়িল । ঘনঘন সিংহনাদে ও তুরী-ভেরী প্রভৃতি বণবাণের তুমুল শব্দে আকাশ-মেদিনী ছাইয়া ফেলিল । “এ আবার কি ব্যাপার ?” ভাবিয়া রঘুনাথ পালটিয়া দেখিতে-না দেখিতে মন্ত্রিপুত্র সদর্পে যাইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল এবং কর্কশস্বরে বলিয়া উঠিল,—আবে রে বর্ষর ! তুই কি না আমার হৃদয়ের ধন চুরি করিয়া লইয়া পলাইতেছিস ? তোর যদি

জীবনের সাধ থাকে তো সুন্দরীকে আমার হস্তে অর্পণ করিয়া পলায়ন কর, নচেৎ এখনই আপন কন্ঠের উচিত শাস্তি লাভ করিবি, আমি তোকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইব। ছি ছি ছাখ্ দেখি, এই ভাস্বর হীরকহার কি তোর মত বানরের গলায় শোভা পায় ? যা, যদি জীবনের সাধ থাকে তো প্রাণ লইয়া পলাইয়া যা, আমি তোকে প্রাণ ভিক্ষা দিতেছি।

রঘুনাথ তেঁ দেখিয়া শুনিয়া অবাক ! পশ্চাতে চাহিয়া দেখেন, অগণিত সৈন্য ধাইয়া আসিতেছে। এ আবার প্রভুর কি লীলা, ভাবিয়া তিনি ভাব-বিভোল হইয়া মন্ত্রিপুত্রের দিকে নির্ভয়-নেত্রে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন। অন্নপূর্ণার কিন্তু বড় ভয় হইল। তিনি পতিকে জড়াইয়া ধরিয়া ভীতি-কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন,—স্বামিন্ ! ঐ সেই মন্ত্রিপুত্র ; ঐ দুর্লভের হস্তেই আমার পিতামাতা আমাকে সমর্পণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঐ কালাস্তক যমের হস্তে তো আর নিস্তার নাই ; ও নিশ্চয়ই তোমাকে বধ করিয়া আমাকে লইয়া যাইবে। ও পাপ আমার স্পর্শ করিলে কিন্তু আমি এ প্রাণ কিছুতেই রাখিব না। পতিই সতীর গতি। এ বিষয়ে আপনার কি বক্তব্য আছে, শুনিতে চাই। আর এই আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায়ই বা কি স্থির করিতেছেন, তাহাও জানিতে-চাই।

সতীর ভীতিমাথা কথা শুনিয়া রঘুনাথ আরও অধিক হাস্ত করিতে-করিতে আশ্বাসবচনে তাঁহাকে বলিলেন,—

“মো প্রভু দারুব্রহ্মমূর্তি । এ চ্ছার কেতের্ক বিপত্তি ॥  
যে তোতে মোতে ভেট করি । যে বিষতাপুঁ কলে পারি ॥

এবে রথিবে সেহি মতে ।                   গো মুখি ! ভয় কিপা চিত্তে ॥  
 ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি যার পাদে ।                   ধামে চিন্তস্তি অপ্রমাদে ॥  
 সে প্রভু খাউ খাউ মোর ।                   কিপা তু ডর নারীবর ॥”

মুখি লো ! তোমার এত ভয় কিসের ? তুমি কি জান না, আমার প্রভু যে সেই দারুণমূর্তি জগন্নাথ । আর এই বিপদই বা কতটুকু ? সুন্দরি ! যিনি তোমার আমার পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করাইয়া দিয়াছেন, যিনি দুঃস্থ বিষতপ হইতে আমাকে পার করিয়াছেন, এ বিপদেও তিনিই আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন । তবে আর তোমার এত ভয়-ভাবনা কেন ? ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি দেবগণ অপ্রমত্ত ভাবে ধ্যানযোগে বাঁহার পাদপদ্ম চিন্তা করিয়া থাকেন, আমার সেই প্রভু থাকিতে-থাকিতে তুমি অত ভীতই বা হইতেছ কি নিমিত্ত ?

রঘুনাথ অন্নপূর্ণাকে এইরূপে প্রভুর গুণ স্মরণ করাইয়া সাহস দিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, দুইজন অশ্বারোহী ক্ষত্রিয় বীর তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত । উভয়ের স্কন্ধে উত্তরীর, পৃষ্ঠ-ভাগে ঢাল, কাটিদেশে ‘বমদাট’ অস্ত্র দৃঢ় আবদ্ধ, যেন সাক্ষাৎ বিক্রম সিংহ মহারাজা । অশ্বের উপর হইতেই তাঁহারা জলদগম্বীর স্বরে রঘুনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হাঁ-হে, তোমাদের বাড়ী কোন্ দেশে ? কোথা হইতে আসিতেছ ? যাইবেই বা কোথায় ? সঙ্গে সুন্দরী রমণী দেখিতেছি, ইনি কে ? আর ঐ যে পাছেপাছে অনেক সৈন্যসামন্ত ধাইয়া আসিতেছে, তাহারাই বা কে ? ব্যাপারখানা কি বল দেখি ?

রঘুনাথ তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া ধীরেধীরে বলিলেন,—

মহাশয় ! এ বড় বিচিত্র ব্যাপার, আছোপান্ত বলিতে গেলে এক-  
খানি প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া পড়ে। সংক্ষেপ কথা, ইনি আমার  
পরিণীতা পত্নী, আমি ইহাকে আপন স্থানে লইয়া বাইতেছি, আর  
ইহারা আমাকে মারিয়া-ধরিয়া আমার পত্নীকে কাড়িয়া লইবার জন্ত  
পাছে-পাছে তাড়া করিয়াছে। আমি তো অনাথ প্রাণী ; সখা-সাক্ষাৎ  
বন্ধু-বান্ধব আমার কেহই নাই ; বল-ভরসা আছেন কেবল সেই  
নীলাদ্রি-চন্দ্রচূড়ামণি চক্রপাণি জগন্নাথ ; তিনি বই আর আমার  
শরণ লইবার রক্ষা করিবার কেহই নাই ; তাই আমরা আকুল  
প্রাণে তাঁহারই রূপা প্রতীক্ষা করিতেছি।

বীরদ্বর বলিলেন,—বটে বটে, এমন ব্যাপার ? ভাল, কই কে  
তোমাদের কাছে আসে,—মার ধর করে একবার দেখি ? ভয় নাই,  
ভয় নাই,—আমরা থাকিতে তোমাদের কোন ভয় নাই, ভয় নাই।  
আমরা তোমাদের আশুপাছু চলিতেছি, চল তোমরা নির্ভয়ে আমা-  
দের সঙ্গেসঙ্গে চল। গুনিয়া রঘুনাথ ও অন্নপূর্ণা ‘প্রভুরই এ মহিমা’  
ভাবিয়া পরমানন্দে জননীৰ পক্ষাচ্ছাদিত পক্ষিশিশুর মত নির্ভয়ে  
গমন করিতে লাগিলেন। দাসদানীরাও অগ্রবর্তী বীরের অগ্রেঅগ্রে  
চলিতে লাগিল। বীরযুগল বৃষ্টি কিছু মারা জানেন। তাঁহারা মাত্র  
দুইজন, কিন্তু মস্তিগুত্র কিংবা সৈন্তসামন্ত সকলে দেখিতে লাগিল যে,  
কোটিকোটি ক্ষত্রিয় বীর রঘুনাথ ও অন্নপূর্ণাকে ঘেরিয়া রহিয়াছে।  
দেখিয়া সকলে ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িল এবং যে যেদিকে পাইল,  
প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল। সে পলাইবার রকমই বা কত ?

“ভেক কণীকি দেখি মেছে । ভয়ে পলান্তি এণে তেণে ॥

কেশরী দেখি মৃগ গজ । বেছে ছয়ন্তি হতবীৰ্য্য ॥

গরুড় দেখি য়েছে ব্যাল । পলাই পশিলা কি বিল ॥

তেমন্তে প্রাণর আরতে । পলাই গলে য়েঝামতে ॥”

সৰ্প দৰ্শনে ভেক য়েরূপ এদিকে ওদিকে পলায়, কেহ কেহ সেইরূপ ছোড়-ভঙ্গ হইয়া পলাইল । সিংহ দেখিয়া হরিণ ও হস্তী যেমন হতবীৰ্য্য হইয়া পলায়ন করে, কেহ কেহ সেই প্রকারে পলায়ন করিল । আর গরুড়কে দেখিতে পাইয়া সৰ্প সকল আকুলি-বিকুলি করিয়া য়েরূপ বিলের মধ্যে প্রবেশ করে, সে ভাবেও কেহ কেহ পলাইতে লাগিল । প্রাণের দায়ে কে যে কোথায় পলাইয়া গেল, তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই ।

রঘুনাথ ও অন্নপূর্ণা কিন্তু ইহার তৰ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না । আনন্দবিশ্বয়ে তাঁহাদের হৃদয় ভরিয়া গেল । নন্দমুগ্ধের মত তাঁহারা বীরযুগলের সঙ্গেসঙ্গেই চলিতে লাগিলেন । কেবল মনে হয়,—ইহারা দুইজন কে ? কিন্তু কি আশ্চর্য্য, জিজ্ঞাসা করিকরি করিয়াও তাঁহারা কিছুতেই জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিতে পারিলেন না ।

সেই রাজ্যের সীমা পার করিয়া দিয়া ক্ষত্রিয় বীরদ্বয় রঘুনাথকে বলিলেন,—“বাও, এইবার তোমরা নির্ভয়ে গমন কর, আর কোন চিন্তা নাই । আমরাও চলিলাম ; আমাদের অনেক কার্য্য ।” রঘু অরক্ষিত তাঁহাদিগকে শতশত প্রণাম করিয়া কহিলেন,—বীর-চূড়ামণি ! আপনাদের দুইজনের কৃপাতেই আজ আমরা শত্রুহন্তে নিস্তার পাইলাম । আপনারা না রক্ষা করিলে দেখিতে-দেখিতে এখনই আমরাদিগকে য়মালয়ে যাইতে হইত । আপনারা যেই হউন,

আপনারা আমাদের প্রাণদাতা । আপনাদের চরণে বারবার প্রণাম করি । জানিবেন, আমরা আপনাদেরই হইয়া রহিলাম ।

বীরযুগল হাশুমুখে 'বেশ বেশ' বলিয়া চলিয়া গেলেন । রঘুনাথও দাসদাসীকে বুঝাইয়া-সুঝাইয়া বিদায় দিয়া অন্নপূর্ণাকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া চলিলেন । কিন্তু চিন্তিতে পারিলেন না যে, এই দুইটি ক্ষত্রিয়বীর কে ? হায় যদি রঘুনাথ চিন্তিতে পারিতেন যে, ইহারাই তাঁহার প্রাণনাথ বলভদ্র জগন্নাথ, তাহা হইলে কি আর রক্ষা থাকিত ? তিনি তাঁহা হইলে তাঁহার সকল সাধ এইখানেই মিটাইয়া লইয়া তবে তাঁহাদের ছাড়িয়া দিতেন । বাঁহার মায়ায় অনরবৃন্দও বিনোদিত, সামান্ত মানব তাঁহাকে চিনিবেই বা কি প্রকারে ? মায়াধীশ জগদীশ ভ্রাত্যের দুঃখ দূর করিয়া নীলকন্দরে শুভবিজয় করিলেন । রঘুনাথ তাঁহাদের চিন্তিতে পারুন আর না-ই পারুন, করুণাময় জগন্নাথের করুণাতেই যে তিনি রক্ষা পাইলেন, এ বিষয়ে আর তাঁহার অণুমাত্র সংশয় রহিল না ; তিনিও সেই প্রভুরই করুণা ভাবিতে-ভাবিতে চলিতে লাগিলেন ।

পথে বাহির হইলে আপদ-বিপদ আছেই আছে । প্রভুরই করুণায় সকল আপদে পার হইয়া তাঁহারা কিছুদিন পরে শ্রীনীলাচল গিয়া পহুছিলেন । আজ আর তাঁহাদের আনন্দের সীমা পরিসীমা নাই । উভয়ে শ্রীমন্দিরে ঘাইয়া তৃষিতনয়নে নীলাচলচন্দ্রের রূপসুখা পান করিলেন । পথের সকল ক্লেশ দূর হইয়া গেল । অন্নপূর্ণার পিতা আসিবার সময় যাহা কিছু ধনরত্ন দিয়াছিলেন, তাহা দিয়া তাঁহারা দেউলের দক্ষিণপার্শ্বে একটি বাটী খরিদ করিলেন এবং

তথায় পরমানন্দে বসবাস করিতে লাগিলেন । রঘুনাথ কিন্তু তাঁহার ভিক্ষা বৃত্তি পরিত্যাগ করিলেন না । তিনি প্রতিদিন প্রভুর শয্যা-খান হইতে আরম্ভ করিয়া আবার শয়ন পর্য্যন্ত আরাত্রিক-ভোগ-শিক্ষার প্রভৃতি লীলা দর্শন করেন, আর যে সময় দর্শন না হয়, সেই সময় ভিক্ষা মাগিয়া বেড়ান । ভিক্ষা করেন বটে, কিন্তু ভিক্ষার জন্ত ক্ষেত্রসীমার বাহিরে কখনও গমন করেন না । কৃষ্ণকথা ছাড়া তাঁহার মুখে আর অন্য কোন কথা নাই ; গোবিন্দগীতি ছাড়া আর অন্য কোন গান করা নাই । তা ভিক্ষাকালেই কি, শ্রীমন্দিরেই কি, আর গৃহেই বা কি । শ্রীমন্দিরে তিনি যখন 'কলারাট-ঘরে' ( জগন্নাথের ঠিক সম্মুখে ভাগ্যাবতারের দক্ষিণপার্শ্বে ) করতাল বাজাইয়া গোবিন্দগীতি গাইতে-গাইতে নৃত্য করিতে থাকেন, আহা তাঁহার তখনকার সেই পুলকপূর্ণ অশ্রুস্নাত পূতমূর্ত্তি কি সুন্দর—কি সুন্দর ! যে দেখে, সে জগন্নাথ দেখিবে, কি তাঁহাকে দেখিবে, কিছুই স্থির করিতে পারে না ।

ভাবসাগর ভগবানের ভাব লইয়াই ভক্তের ভাব । ভক্তের ভাব আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু ভগবানের ভাব অধিকার করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না । ভগবান্ অখিল-রসানুভূত-মূর্ত্তি,—ভাব-মাধুর্যের ভাগ্য । তাই তাঁহার রসে রসিয়া তাঁহার ভাবে মজিয়া ভক্ত যখন বিভোর হইয়া নাচিতে গাইতে থাকেন, তখন তাঁহাকে দেখিলে পামরপাষণ্ডেরও নমন ভুলিয়া যায়—মন-প্রাণ গলিয়া যায় । ভাব-বিভোর ভক্তকে দেখিয়া ভগবান্কে দেখিলে সে-যে কি সুন্দর কি মনোহর দেখায়, তাহা যে দেখিয়াছে, সে-ই বুলিয়াছে ; অন্তকে



ধুলাইবার নহে । তখন যেন সেই ভগবান্ই আর এক রকম হইয়া পড়েন,—তখন যেন সেই কাষ্ঠ-পাষণ-ধাতুমূর্ত্তি ভেদ করিয়া ভাবে-ভরা রসেপোরা কি এক মধুরমধুর মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠে । এ মূর্ত্তি কখনও দেখিয়াছ কি ভাই ? যদি না দোখরা থাক তো ঐ ভাব-বিভোর রঘুনাথকে মানসচক্ষে দেখ, আর তাঁহার সম্মুখে ঐ জগন্নাথকে দেখ—এঁকে দেখিয়া ওঁকে দেখ, আবার ওঁকে দেখিয়া এঁকে দেখ, চিরমধুর চিরনবীন মাধুর্যা-সাগরে তুমিও ডুবিয়া যাইবে ।

রঘুনাথ এইরূপে কখনও কলারাটগৃহে নৃত্য করেন, কখনও জগনোহনে আসিয়া গড়াগড়ি দিতে থাকেন, কখনও বা গরুড়ের পশ্চাতে দুই বাছ তুলিয়া দাঁড়াইয়া আপনার অন্তরের কথা প্রভুকে বিজ্ঞাপিত করেন । ফল কথা, তিনি অন্তরে-বাহিরে হরিময় হইয়া সেই হরিক্ষেত্রে কালাযাপন করিতে লাগিলেন । ভিক্ষা করিয়া যাহা পান, তাহা পতিব্রতা অন্নপূর্ণার হস্তে আনিয়া দেন । অন্নপূর্ণা তাহা দেবী অন্নপূর্ণার মত পরমানন্দে পাক করেন এবং অতিথি-অভ্যাগত সাধুসন্ন্যাসীকে ভোজন করান ; পরে পতিকে আহাৰ করাইয়া অবশিষ্ট থাকিলে নিজেও ভোজন করেন । কিন্তু পতির ভোজন না হইলে সতী বারিবিদুও পান করেন না । পতিই তাঁহার পরনারায়ণ পরম দেবতা শ্রীপতি ।

রঘু অরক্ষিতের ভাবময় নর্ত্তনগীতি ও ভগবানে ভক্তিই তাঁহাকে অন্নকালের মধ্যে সকলের প্রীতিশ্রদ্ধার পাত্র করিয়া তুলিল । বৈষ্ণব-সেবনের গুণেও অন্নপূর্ণার নাম দেশেদেশে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল ।

তাঁহারা সর্বজনপ্রিয় হইয়া হরিভজনে মজিয়া রহিয়া সেই হরিক্ষেত্রেই  
মানবজন্ম সাংগক করিতে থাকিলেন ।

উৎকল-কবি বিপ্র রামদাস এই ভক্তচরিত্র বর্ণনার অবসানে  
দশেন্দ্রিয়াধিপতি মনের প্রতি সাংঘাধন করিয়া বলিয়াছেন,—

“ভগত নিমন্তে শ্রীবৎস ।      ছয়ন্তি সে এড়ে সপক্ষ ॥  
কেবল নিশ্চল হৃদয়ে ।      ডাকিলে লক্ষ্যে যোজনরে ॥  
পাশে ডাকিলা প্রায়ে মনি ।      তাকু রথন্তি চক্রপাণি ॥  
কুটিল হৃদ যেউ নয় ।      সে ডাকু রহিণ পাশর ॥  
তাকু বধিরজন মতে ।      শুনন্তি নাহি কদাচিত্তে ॥  
এণু বিশ্বাস একা মূল ।      শুন হে মন মহীপাল ॥”

মন ! তুমিই না এ দেহরাজ্যের রাজা । রাজার আদেশ প্রজার  
মত সকল ইন্দ্রিয়ই তো তোমার আদেশ অদনতমন্তকে বহন করিয়া  
থাকে । তাই তোমাকেই দেখাই, তুমি দেখিলেই আর সকলেই  
দেখিতে পাইবে বলিয়া তোমাকেই দেখাই, দেখ দেখি একবার,  
ভক্তরক্ষার নিমিত্ত শ্রীবৎসলাঞ্ছন ভগবান্ কত সহায় কত সপক্ষ  
হইয়া থাকেন ? আহা, সেই চক্রপাণি চিন্তামণি যদি লক্ষ্য যোজন  
দূরেও অবস্থান করেন, আর কেহ তাঁহাকে নিশ্চল হৃদয়ে আহ্বান  
করিতে থাকে, তাহা হইলে তিনি—“বুঝি এই আমার পাশে হইতেই  
কেহ আনাকে ডাকিল” মনে করিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ রক্ষা করিয়া  
থাকেন । আর যদি কেহ কুটিল হৃদয় লইয়া তাঁহার গা ঘেঁসাঘেঁসি  
থাকিয়াও তাঁহাকে গলাবাজি করিয়া ডাক দিতে থাকে, তাহা হইলে  
সেই চিকণকালী কালারই মত সে কথা কখনও কাণে তুলেন না,—  
যেন শোনেই নাই । কিন্তু মন ! জানিও, এ বিষয়ে বিশ্বাসই

হইতেছে একমাত্র মূল । যদি বিশ্বাস কর তো সততই তাঁহার দয়ার  
হস্ত ইতস্তত দেখিতে পাইবে,—করুণার অমিয়-ঝঙ্কারে কর্ণযুগল  
শীতল করিতে পারিবে । বিশ্বাস কর মন ! বিশ্বাস কর । ঈশ্বরে—  
তাঁহার শক্তিতে—তাঁহার অলৌকিক আচরণে বিশ্বাস কর মন !  
বিশ্বাস কর । তাহা হইলে তোমাকে আর তাঁহার তত্ত্বনিরূপণ  
করিতে গিয়া হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইবে না ।

আমরা আর কি বলিব, কেবল করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা  
করি, উৎকল কবির এই কোমল-কান্ত পদাবলী যেন অমূল্য মণি-  
মালিকার মত বিশ্ববাসীর কণ্ঠে কণ্ঠে বিরাজ করিতে থাকে,—আর  
সরল বিশ্বাসের উজ্জ্বল আলোকে যেন সকলের অন্তর-বাহির  
আলোকময় হইয়া উঠে ।

---

## দামোদর দাস ।

দামোদর দাসের নিবাস কাঞ্চীনগরে । জাতিতে ব্রাহ্মণ । পুত্র নাই, কন্যা নাই, আছেন কেবল একমাত্র পত্নী । ভিক্ষাই তাঁহার জীবিকা । সমগ্র সংসার খুঁজিয়া তাঁহার মত আর একটি দারিদ্র ভিখারী পাওয়া যায় কি না সন্দেহ । তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া স্নান-আহ্নিক সারেন, দ্বাদশ অঙ্কে দ্বাদশ তিলক রচনা করেন, মস্তকের উপর নির্ম্মালা তুলসীদল ধারণ করেন, এবং মুখে 'রাম কৃষ্ণ হরি' নাম কীৰ্ত্তন করিতে-করিতে ভিক্ষার নিমিত্ত নগরবাসীর দ্বারে দ্বারে পর্যটন করিতে থাকেন, আবার সন্ধ্যা হইলে গৃহে ফিরিয়া আসেন । ভিক্ষায় কিছু জুটিলে ভালই ; না জুটিলেও প্রাণে অসন্তোষ নাই । তিনি ভিক্ষালব্ধ যাহা-কিছু পতিপ্রাণা পত্নীর হস্তে আনিয়া দেন, পত্নীও পরমানন্দমনে তাহা পাক করেন এবং ভগবানকে অর্পণ করিয়া উভয়ে প্রসাদ পাইয়া থাকেন । ইতিমধ্যে যদি কোন সুধার্ত্ত অতিথি আসিয়া উপস্থিত হন, তবে তাঁহারা তাহাদেরই অগ্রে সেবা করান, পরে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তদেই সেদিন তাঁহাদের উদর ভরণ হইল, নচেৎ উপবাসী থাকিতেও তাঁহারা কাতর নহেন, তাহাতেও তাঁহাদের পরমানন্দ ।

পতি-পত্নীর প্রধান কার্য্য হইতেছে গোবিন্দ-ভজন । তাহাতেই তাঁহারা অহ্নিশ মাতিয়া আছেন । পরচর্চা নাই, কাহারও গ্লানি করা নাই ; হৃদয় তাঁহাদের জীব-দয়ার সদাই বিগলিত । অত

যে অভাব, কিন্তু ভগবানের কাছে তাঁহারা নিজের জ্ঞান কিছুই চাহেন না, চাহেন কেবল জীবের মঙ্গল । পতিপত্নী হরিভজন করিতে-করিতে যখনই হরির দেখা যেন পেয়েছি-পেয়েছি মনে করেন, তখনই তাঁহার কাছে কৃতাজলিপুটে প্রার্থনা করেন,—  
 মঙ্গলময় ! জগতের জীব তো তোমার মঙ্গলময় মূর্তি দেখিল না, মঙ্গল ভাবিয়া অমঙ্গলকেই তাহারা আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে, ঠাকুর ! তাহাদের প্রতি দয়া কর ;—তাহাদের ভ্রান্তি দূর করিয়া দাও,—তোমার আনন্দ-মন্দাকিনীর পুতধারায় তাহারা অভিষিক্ত হউক,—হিংসা-দ্বेष ভুলিয়া সকলেই সকলকে ভালবাসিতে শিখুক, তোমার সর্বমঙ্গলমঙ্গলা মূর্তি সকলের হৃদয়ে-হৃদয়ে জাগরুক রহুক ।

চন্দ্রমধ্যে আবদ্ধ থাকিলেও মৃগনাভির গন্ধ ফুটিয়াই বাহির হয় । দামোদর দাসেরও যশোগন্ধ সেই ছিন্নকস্থা বা জীর্ণ পর্ণকুটীরের আবরণ মানিল না, সে-ও তাহা ভেদ করিয়া দেশেদেশে ছড়াইয়া পড়িল ; এ-দেশ ও-দেশ যাইতে-যাইতে ক্রমশ সেই আসল দেশে,—যে দেশে গেলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না—সেই আমাদের আসল দেশেও যাইয়া পঁছছিল । সে দেশের বসিক রাজা অমনি সেই গন্ধ ধরিয়া কাঞ্চীনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । উদ্দেশ্য—জিনিষটা আসল কি মকল, একবার বুঝে দেখা । রাজা বড় মায়াবী । আসিয়াই তিনি এক মায়া-সন্ন্যাসি-মূর্তি ধরিলেন । তাঁহার সর্বাঙ্গে বিভূতি, গলে রুদ্রাক্ষমালা, মস্তকে জটা, কর্ণে তাম্র-কুণ্ডল । ইর্ষল বৃদ্ধ শরীর—যেন একটি পা চলিবার শক্তি নাই ।

যষ্টি-হস্তে ধীর-পদ-বিক্ষেপে তিনি দামোদর দাসের দ্বারদেশে আসিয়া  
বসিয়া পড়িলেন ।

এদিকে দামোদর দাস সেদিন ভিক্ষার একমুষ্টি তুলাও পান  
নাই, রিক্ত-হস্তে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছেন ; পতি-পত্নী উভয়ে  
ক্ষুৎক্ষাম-দেহে ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া চিন্তামণির চরণ চিন্তা  
করিতেছেন । মনেমনে বলিতেছেন,—

“ভো প্রভু দীনজনবন্ধু ।	নাম করুণাময় সিন্ধু ॥
অরক্ষ-রক্ষণ তো বাণী ।	ভূতা-হরিত-বজ্র-সেহা ॥
দুর্জ্ঞান-মণ্ডুকর ফণী ।	জগত-জন-চিন্তামণি ॥
গর্বিত-করীর কেশরী ।	সকল জীবে অধিকারী ॥
তেগু শরণ গলি তোতে ।	আতঙ্ক রক্ষা কর মোতে ॥
এড়ে নিষ্ঠুর সময়রে ।	যেবে অতিথি মোর দ্বারে ॥
আগ্নি হইব প্রবেশ ।	তাহাকু দেবি মুহিঁ কিস ॥”

ঠাকুর ! তুমি প্রভু ;—নিগ্রহ করিলে করিতে পার, অনুগ্রহ  
করিলেও করিতে পার । কিন্তু দীনের তো আর কেহই নাই,  
তুমিই তাহাদের একমাত্র বন্ধু । তাই না তোমার লোকে  
করুণার অপার সাগর বলিয়া ডাকিয়া থাকে । তাহাদের আর  
রক্ষা করিবার কেহই নাই, তাহাদিগকে রক্ষা করিবে  
বলিয়াই না তুমি তোমার চক্রে নিশান উড়াইয়াছ । ঠাকুর !  
তুমি বজ্র-বর্ষের মত তোমার ভূত্যের অঙ্গে রহিয়া তাহার  
সমস্ত হরিত দূর করিয়া দাও । নাথ ! তুমি দুর্জ্ঞান-রূপ ভেকের  
কালান্তক কালসর্প । তুমি জগতবাসি-জনের অমূল্য চিন্তা-  
মণি । তুমি গর্ভমদে মত্ত মানব-মাতঙ্গের বিনাশকারী কেশরী ।

তুমি সকল জীবেরই অধিপতি । তাই আজ এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবাধমও তোমার শরণাগত হইয়াছে । তাহাকে তাহার আতঙ্ক হইতে রক্ষা কর প্রভু ! রক্ষা কর । আতঙ্ক আর কিছুই নয় ঠাকুর, এ দাস মহামহিম নামমন্ত্ৰের মহাপ্রভাবে জাগতিক তুচ্ছ আতঙ্ক কি, মরণভয়েও ভীত নহে, সে আতঙ্কনাশের জন্তুও সে প্রার্থনা করিতেছে না । তাহার ভয়—যদি এই দুঃস্থ সময়ে তাহার দ্বারে কোন অতিথি আসিয়া উপস্থিত হন, তবে তাঁহার সেবা নিরীহ হইবে কি প্রকারে ?

যেখানেই বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা হয় । দানোদর দাস ও তাঁহার পত্নী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন । তাঁহাদের নয়নজলে ধরিত্রী আর্দ্র হইয়া যাইতেছে ; আর এমনই সময় তাঁহাদের কর্ণে অতিথির করুণ স্বর যাইয়া প্রবেশ করিল,—“ঘরে কে আছ হে, আমি অতিথি তোমাদের দ্বারে অপেক্ষা করিতেছি ।” অতিথির কাতর কণ্ঠস্বর কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিবা মাত্রই দানোদর দাস শশবাস্তে বাহিরে আসিলেন । দেখিলেন, শান্তক্লান্ত জরাজীর্ণ জ্যোতিষ্ময় যোগী মহাপুরুষ । তিনি ভক্তিভরে তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং অতি বিনীতভাবে কৃতাজলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“স্বামিন্ ! দাসের প্রতি কি অনুমতি হইতেছে, অকপটে প্রকাশ করুন ।” মায়াযোগী বলিলেন,—“বাপুহে ! তোমার বড় কীর্তি শুনি—তুমি নাকি অতিথি-অভ্যাগতকে পরমাদরে ভোজন করাও । আমি তো যার-তার বাড়ী আহাৰ করি না ;—অতিথিসেবার যাহার শ্রদ্ধা নাই, সে আহাৰের জন্তু যাচা-

যাচি করিলেও আমি তাহার দিকে ফিরিয়া দেখি না, কিন্তু শ্রদ্ধালু অতিথিভক্তের অন্তই আমি আপনি চাহিয়া ভোজন করিয়া থাকি । অতিথি-সেবকের মধ্যে তোমার নামটা প্রায়ই কাণে আসে, তাই তোমার অন্তে বড় লোভ হইল ; আজ মনে হইল—যাই একবার দামোদর দাসের বাড়ী ভোজন করিয়া আসি ; তাই বাবা ! এসেছি,—প্রাচীন শরীর চলা-ফেরা করা ভার, তবুও তোমার অন্ত ভোজনের লোভেই এসেছি, এখন একমুষ্টি অন্ত দিবে কি না বল ।”

হায় হায়, দামোদর দাস যে আশঙ্কার অধীর হইয়া উঠিয়া-ছিলেন, সেই আশঙ্কাই তাঁর উপস্থিত ! অতিথির কথা শুনিয়া তিনি বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িলেন । কি করেন, শ্রীহরির যাহা ইচ্ছা, ভাবিয়া তিনি শীতল মলিলে যোগিবরের পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন এবং মিষ্টবাক্যে বলিলেন,—ঠাকুর ! আপনাকে বড়ই পথশ্রান্ত দেখিতেছি, আপনি এই তৃণাসনে একটু বিশ্রাম করুন, আমি এখনই আসিতেছি । বাঁলয়া তিনি পত্নীর নিকটে গমন করিলেন এবং অনুচ্চস্বরে কহিতে লাগিলেন,—সত্যি ! দ্বারে অতিথি উপস্থিত, ভোজন ভিক্ষা করিতেছেন, ঘরেও তো কিছুই নাই, এখন কি উপায় করা যায় বল ?

পত্নী বলিলেন,—স্বামিন্ ! আমার জিজ্ঞাসা করাই বৃথা । তোমার তো আর অজ্ঞাত কিছু নাই । ঘর-দ্বার বেচিলেও আমাদের এক পণ কোড়ি হওয়া কঠিন । হায়, যদি একখানি বস্ত্র থাকিত, তাহা হইলেও তাহা বেচিয়া কিছু-না-কিছু পাওয়া



যাইত ; তাহাও তো নাই নাথ ! ছেঁড়া নেকড়া আর মাটির জল-পাত্রই আমাদের একমাত্র সম্বল ; তাহার বিনিময়ে কে আর আমাদের কোড়ি দিতে যাইবে ? এই বলিয়া সতী অধোবদনে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন । দেখিয়া দামোদর দাসের নয়নও অশ্রুপূর্ণ হইল । তিনি একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কেবল বলিলেন,—তবে কি হবে সতি ! তবে কি হবে ? তবে কি অতিথি-সেবা হবে না ? হায় হায়, দ্বার হইতে অতিথিই যদি ফিরিয়া গেলেন, তবে আর ছার জীবনে প্রয়োজন ? গোবিন্দ হে ! এ কঠোর পরীক্ষা কেন প্রভু ?

পতির অবস্থা দেখিয়া পতিব্রতার বড় ভয় হইল, ভাবনার তাঁহার শরীর খরখর কাঁপিয়া উঠিল ; তিনি একান্ত মনে আকুল প্রাণে সেই অকুলের কাণ্ডারী শ্রীহরিকে ডাকিতে লাগিলেন । ক্রমকাল পরে তিনি যেন চমকভাঙ্গা হইয়া পতির প্রতি হাসিহাসি মুখে বলিয়া উঠিলেন,—স্বামিন্, অত কাতর হইতেছ কেন ? আমাদের প্রভু যে সেই জগন্নাথ ; নিশ্চয়ই তিনি অতিথির অন্ন দিবেনই দিবেন । এখন তুমি এক কাজ কর, শীঘ্র নাপিত-ভবনে গিয়া একখানি 'ক্ষুর' চাহিয়া আন । তার পর যাহা করিতে হইবে বলিতেছি ।

দামোদর দাস কি করেন, তিনি তাড়াতাড়ি নাপিত-গৃহ হইতে একখানি ক্ষুর চাহিয়া লইয়া আসিলেন । পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বল, এখন কি করিতে হইবে ? পত্নী হাঁসিতে-হাঁসিতে তাঁহার কেশদাম দেখাইয়া বলিলেন,—দেখ, আমার এই কেশ-

রাশির অর্ধাংশ ঐ কাতুরী দিয়া কাটিয়া ফেল, তার পর দুজনে মিলিয়া চুল-বাধিবার দড়ি তৈয়ারি করিয়া ফেলি ; আর তুমি গিয়া সেগুলি বেচিয়া কোড়ি আন, অতিথিসেবার ভাবনা কিসের ?

দামোদর দাস মনেমনে সহধর্মিণীর শত ধন্যবাদ দিতেদিতে স্বহস্তে তাঁহার মস্তকের চারিধারের কেশগুলি রাখিয়া দিয়া মধ্য-ভাগের কেশগুচ্ছ পুঁছিয়া কাটিয়া লইলেন এবং দুইজনে তাড়াতাড়ি দড়ি বিনাইতে বসিয়া গেলেন । যত শীঘ্র সম্ভব এক রকম মোটা-মুটি দড়ি বিনানো হইয়া গেল । দামোদর দাস তাহা বিক্রয় করিতে লইয়া গেলেন । ভাগ্যবশে পথেই একজন ধরিদার জুটিয়া গেল । পাঁচপণ কোড়ি দিয়া দড়িগুলি সে কিনিয়া লইল । দামোদরও মহানন্দ-মনে সরু চাউল, মুগের বিয়লী, ঘৃত, নবাত, ছন্ধ, দহি, তরি-তরকারি প্রভৃতি কিনিয়া আনিয়া পত্নীর সমীপে হাশ্র-মুখে উপস্থিত হইলেন । পতিব্রতা পাককার্যে বড়ই নিপুণা ; দেখিতে-দেখিতে তিনি অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন । দামোদর দাস মহা হর্ষমনে সাদর-সম্ভাষণে অতিথিদেবতাকে গৃহ-মধ্যে আনয়ন করিলেন । পতি-পত্নী উভয়ে মিলিয়া পরমাদরে তাঁহার চরণ প্রক্ষালন করিয়া দিলেন । দুইজনে ভক্তিভরে সেই জল কিঞ্চিৎ পান করিলেন, কিঞ্চিৎ মস্তকে ধারণ করিলেন । আহা, এখন তাঁহাদের আনন্দ রাখিবার আর স্থান নাই ।

অহো, আজ ইহাদের কি ভাগ্য ! ব্রহ্মা আপন কমণ্ডলুতে ভরিয়া রাখিয়াও যে জল একবিন্দু লাভ করিতে পারেন নাই,

আর ইহারা কিনা আজ আপন ঘরে বসিয়া তাহা সাধ মিটাইয়া পান করিয়া লইলেন ! কারণ আর কিছুই নয়,—

“ভাবকু নিকট গোসাই । অভাবলোকে ভেট নাহি ॥”

অন্তরের বিশুদ্ধ ভাব লইয়াই কথা । যেখানে ভাব-কদম্ব ফুটিয়া উঠে, মধুলম্পট মধুকরের মত গোসাই ( প্রভু—ভগবান্ ) তাঁহার সেই ভাবগন্ধ ধরিয়া আপনি সেখানে যাইয়া উপস্থিত হন । কিন্তু অ-ভাব অর্থাৎ ভাবহীন ব্যক্তি কিছুতেই তাঁহার ভেট বা দর্শন লাভ করিতে পারে না । তাই না সাধক কবি রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন,—

“সে যে ভাবের মানুষ ভাব ব্যতীত অ-ভাবে কে ধ'র্ত্তে পারে ॥”

একথানা ভাঙ্গা পিঁড়া ছিল । পতিপত্নী তাহাই পাতিয়া দিয়া আদর করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন । একখানি কলাপাতা বিছাইয়া তাহার উপর অন্ন-ব্যাঞ্জন পরিবেশন করিলেন । শ্রীগোবিন্দও মহানন্দে ভোজন করিতে লাগিলেন । বুড়া মানুষ, বড় বেশী খাইতে পারিবেন না, ভাবিয়া তাঁহারা অধিক অন্ন-ব্যাঞ্জন তাঁহাকে দেন নাই ; দেখিতে-দেখিতে সেই সামান্য অন্ন-ব্যাঞ্জন সমস্তই মায়া-বৃদ্ধ উদরস্থ করিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন,—আর কিছু থাকে তো আমার দাও, উত্তম পাক হইয়াছে ; ভারি তৃপ্তি-পূর্ব্বক আহাৰ করিতেছি । দামোদর দাসের পত্নী অমনি তাড়া-তাড়ি গিয়া অবশিষ্ট অন্ন-ব্যাঞ্জন যাহা কিছু ছিল সমস্ত আনিয়া অতিথির পত্রে পরিবেশন করিলেন । অন্তর্যামী জানিলেন যে, ইহাদের ঘরে খাওয়াব্য আর কিছুই নাই, তিনি সেই অন্ন-ব্যাঞ্জন-

গুলি চাঁচপোচ করিয়া খাইয়া ফেলিলেন। পরে আচমন করিয়া বসিয়া-বসিয়া হরিতকী ভক্ষণ করিতে লাগিলেন, আর ভাবিতে থাকিলেন,—অহো, ইহাদের জীবন ধন্য ! ঘরে কিছুই নাই, সম্বলের মধ্যে হেঁড়া নেকড়া এবং ভাঙ্গা ভাঁড়, তবুও কিন্তু অতিথি-সেবায় কি অপূর্ব অনুরাগ ! এই যে আজ আমাকে সমস্ত অন্ন-ব্যঞ্জন আহার করাইয়া ইহারা উপবাসী রহিয়াছে, কই তাহাতেও তো ইহাদের অসন্তোষ কিছুই দেখিতেছি না। আশ্চর্য্য ! যে কেশের জন্ত রমণী কতই না কি করিয়া থাকে, অতিথিসেবার জন্ত সে কেশেও তো দাসপত্নীর অণুমাত্র আসক্তি দেখা গেল না। ইহাদের জোড়া কি আর জগতে মিলে ? ভগবান্ ভক্তের ভাবে বিভোর হইয়া এইরূপ কত কি ভাবিলেন, কিছুক্ষণ পরে দামোদর দাসকে আপন সমীপে ডাকিয়া বলিলেন,—ওহে ভক্ত ! তোমাদের সেবায় বড় সন্তোষ লাভ করিয়াছি ; তা বাপু ! দেখিতে-দেখিতে রাত্রিটাও হইয়া পড়িল, বৃদ্ধ শরীর, আজ আর চলিয়া যাওয়া পোসাইবে না দেখিতেছি, রাত্রিটা এ ইখানে কাটাইয়া কল্যা প্রাতেই চলিয়া যাইব এখন। তা, আমার জন্ত আহারের আয়োজন বড় বেশী কিছু করিতে হইবে না, এই ‘এক ওলি’ ( ছোট মাটির ভাঁড়ের এক ভাঁড় ) অন্ন হইলেই আমার চলিয়া যাইবে।

দামোদর দাস ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া পত্নীর নিকট গমন করিলেন এবং চিন্তা-মলিন-মুখে বলিলেন,—সতি ! অতিথির আজ আর চলিবার শক্তি নাই, রাত্রিটা তিনি এইখানেই কাটাইবেন, বলিতে-

ছেন । আহাৰেৰ জোগাড়ও তো চাই, এখন উপায় ? পতিব্ৰতা হাসি-হাসি মুখে বলিয়া উঠিলেন,—তার আর চিন্তা কি ? এই বাকি চুলগুলি কাটিয়া ফেল ; আবার দুজনে বসিয়া চুলবাধা দড়ি বিনাইয়া ফেলি, তার পর তুমি গিয়া সেগুলি বেচিয়া চাল দাল আদি কিনিয়া আন ; তার আর অত ভাবনা কেন ? পত্নীর কথা শুনিয়া দামোদর দাস তাঁহাকে শতশত সাধুবাদ দিলেন এবং কাতুরী ( ক্ষুর ) দিয়া তাঁহার মাথার সমস্ত চুলগুলি পুঁছিয়া কাটিয়া লইলেন । পরে দুজনে বসিয়া দড়ি বিনাইয়া ফেলিলেন । পূৰ্বেৰ মত সেই দড়ি বিক্রয় করিয়া পাঁচ পণ কোড়ি পাইলেন এবং তাহাতেই চাল দাল প্রভৃতি কিনিয়া আনিলেন । পত্নীও হর্ষভরে রক্ষন করিতে বসিয়া গেলেন । আহা, সধবার আজ বিধবার ভাব দেখিলে চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইয়া পড়ে । তিনি কেশহীন মস্তকে একটু কানি বাধিয়া রাখিয়া দিয়াছেন মাত্র । পূণ্যবতী সতীর আয়ুদানেই আজ অতিথিসেবা হইল, ভাবিয়া দামোদর দাস আনন্দ অনুভব করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহার দিকে দৃষ্টি পড়িলেই, সেই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তিনি আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিতেছেন না ।

রান্না-বান্না হইয়া গেল, আবার তাঁহারা অতিথিকে আদর করিয়া আহাৰ করাইলেন । এবাৰেও ভগবান্ 'আরো দাও আরো দাও' করিয়া সমস্ত অন্ন-ব্যঞ্জনই খাইয়া ফেলিলেন, পিপীলিকার প্রত্যাশার মতও পাতে কিছুই রাখিলেন না । আচমনাদি হইয়া গেল । দামোদর দাস তাঁহার শয়নের জন্ত এক

খানি ছিন্ন তৃণাসন বিছাইয়া দিলেম । তিনিও তাহাতেই শয়ন করিলেন ।

“যার আসন নাগরাজ ।      আবার বিনতা-আত্মজ ॥  
 মুনিষ্ক হৃদয়কমল ।      রুদ্রদেবতা-বক্ষঃস্থল ॥  
 সে পুনি ভগত-ভাবে      শোইলে তৃণশয্যাপরে ॥”

হায় হায়, নাগরাজ অনন্তদেব, বিনতানন্দন গরুড়ের পৃষ্ঠদেশ, মুনিগণের হৃদয়-কমল এবং রুদ্রদেবতার বক্ষঃস্থল যাহার আসন, ভক্তের ভাবের বলিহারি যাই, আজ সেই ভাবের প্রভাবে তিনি কিনা তৃণশয্যায় শয়ন করিলেন ! অহো, ধনু সেই ভক্তের বিগুঢ় ভাব, আর ধনু সেই ভাবাধীম ভগবান্ !

দামোদর দাস তখন ধীরেধীরে প্রভুর পাদ সংবাহন করিতে লাগিলেন এবং তাহার পত্নী ছিন্ন বসনের অঞ্চল দিয়া আন্তেআন্তে বাতাস করিতে থাকিলেন । আর ভাবে-ভোলা ভগবান্ বৈকুণ্ঠের সুখ তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে করিয়া যেন নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন ।

অতিথিকে নিদ্রিত দেখিয়া সুন্দরী তাহার স্বামীকে বলিলেন, —আহা, অতিথি ঠাকুর বড়ই বৃদ্ধ, এই অশক্ত শরীরে ইনি কালই বা কি প্রকারে পথ চলিয়া যাইবেন ? কল্য প্রাতঃকালে উঠিয়াই তুনি ভিক্ষা মাগিতে গমন করিও, ভাগ্যে যাহা মিলিবে, তাই দিয়াই ইহার সেবা করা যাইবে, তারপর আমরা আজিকার মত কল্যও উপবাসী रहিব। যেমন স্ত্রী, তেমনই স্বামী ; তিনিও অমনি বলিয়া উঠিলেন,—হাঁ হাঁ সেই কথাই ভাল ।

আগ্রং, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার যিনি অতীত, তাঁর

আবার জাগাই বা কি, আর ঘুমানই বা কি ? ভগবান্ শুইয়া শুইয়া সকলই গুণিতেছেন, গুণিতে-গুণিতে তাঁহার নয়ন-কমল ছল-ছল করিয়া উঠিল । ঐ যে—ঐ যে নয়নের কোণ দিয়া করুণার ধারাও যে গড়াইয়া পড়িল । আহা, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, দুইজনকে মায়ানিদ্রায় অভিভূত করিয়া তাড়া-তাড়ি উঠিয়া পড়িলেন । দেখিলেন,—পতি-পত্নী তাঁহার চরণতলে পড়িয়া রহিয়াছেন । দেখিয়া করিলেন কি ? প্রথমেই তিনি পতিব্রতার মূণ্ডিত মস্তকে শ্রীহস্ত বুলাইতে-বুলাইতে বলিতে লাগিলেন,—পতিব্রতে ! মা ! মা !—আহা কি মিষ্ট, কি মিষ্ট,—আবার বলি—মা ! মা ! তোমার মস্তক কুঞ্চিত-কেশ-কলাপে পূর্ণ হইয়া যাউক ; মা ! মা ! তোমার সকল শরীর নানা মণিমাণিক্য অলঙ্কারে বলমল করিয়া উঠুক ; মা ! মা ! তোমার অঙ্গেঅঙ্গে ষোড়শী রূপসীর সৌন্দর্য্যসুধমা তরঙ্গাঙ্কিত হইতে থাকুক । শ্রীহরির শ্রীমুখের কথা ফুরাইতে-না-ফুরাইতে তাঁহার তাহা তাহাই হইতে লাগিল, দেখিয়া আনন্দময়ের আনন্দ যেন উত্তরোত্তর বাড়িয়া-বাড়িয়াই উঠিতে লাগিল । তিনি এইবার দাঁড়াইয়া উঠিলেন । চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন । করুণা-কম্পিত-কণ্ঠে কহিলেন,—কুটীর ! তুমি অট্টালিকা হও । তাহাই হইল । প্রভু আবার এদিক-ওদিক চাহিয়া বলিলেন,—গৃহ-দ্বার ধনরত্নে পুরিয়া যাও । তাহাই হইল । প্রভু তখন হর্ষমনে পতি-পত্নীর মস্তকে দুইটি করপয় রাখিয়া ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ-আশীর্ষাদের অমৃত বর্ষণ করিতে লাগিলেন । আধ আধ মধুনয় ভাষে বলিলেন—

“জীবন্তে সুখী হোই খাম । অস্তে বৈকুণ্ঠ গতি পাম ॥”

ওগো তোরা সুখেসুখে জীবন অতিবাহিত কর, আর জীবন ফুরাইয়া গেলে বৈকুণ্ঠ-গতি লাভ কর । আমি তোদের জীবনে-মরণে সঙ্গের সাথী হইয়া রহিলাম ।

ভক্তযুগলকে অমিয়ময় আশীর্ব্বাদে সম্বন্ধিত করিয়া ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন । নিশার অবসানে সতীর নিদ্রাভঙ্গ হইল । নয়ন মেলিয়া দেখেন, এ কি আচম্বিত কথা, সেই আমি কি এই আমি ? কই, আমার পরিধানের ছেঁড়া নেকড়া কোথায় গেল, এ যে দেখিতেছি, বহুমূল্য বস্ত্র । ওঃ আমার গারে এত গহনা কোথা হইতে আসিল ? মাথায় হাত দিয়া তিনি আরও অধিক বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন । ভাবিলেন,—তাইতো এ নেড়া মাথা,—রাতারাতি রাশিরাশি চুল গজাইল কি প্রকারে ? তারপর সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া দেখেন—জীর্ণ শীর্ণ রঙ্গ দেখে আদ্য-যৌবনের চলতল লাবণ্য কোথা হইতে আসিল ? হার হার, আমি কি খেয়াল দেখিতেছি ? কই, সেই অশক্ত-শরীর অতিথিই বা কোথায় গমন করিলেন ? তাঁহাকেও তো দেখিতে পাই-তেছি না ? সতী সেই ভূমিশয়া হইতে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িলেন । এদিক-ওদিক চাহিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে আর তাঁহার বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রহিল না । দেখিলেন,—সে পর্ণকুটার নাই, সে তৃণশয়া নাই, সে ভগ্ন মৃত্তিকাভাও নাই, আর সেই শতগ্রহি বস্ত্রখণ্ডও নাই ;—এ যে প্রকাণ্ড অট্টালিকার প্রশস্ত প্রকোষ্ঠ, মহামূল্য মণিমাণিক্য এবং ধন-ধান্য বসন-ভূষণে ভরিয়া



বহিরাছে । অহো, পতিও যে আমার দিব্য কন্দর্পমূর্তি হইয়া-  
ছেন । কি বিচিত্র ব্যাপার ! অবলা বাগ্রভাবে নিদ্রিত পতির  
হস্ত ধরিয়া টানিয়া তুলিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—  
নাথ ! দেখ দেখ কি বিচিত্র—কি বিস্ময়কর ব্যাপার । দামোদর  
দাস নিদ্রিত-নেত্রে ‘কি কি’ বলিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং দুই  
হস্তে দুইটি চকু রপড়াইয়া লইয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিতে লাগি-  
লেন । সতীর আর বিলম্ব সহিল না, তিনি ব্যস্তসমস্তভাবে  
পতির হস্ত ধারণ করিয়া বাহিরের দিকে টানিয়া লইয়া চলিলেন,  
আর বলিতে লাগিলেন,—ওগো, এখানকার দেখা-টেকা এখন  
রেখে দাও, চল—সত্বর বাহিরে দেখ্বে চল, সে অতিথি ঠাকুর  
গেলেন কোথায় ? তিনি সামান্য লোক নন গো সামান্য লোক  
নন । দামোদর দাস অমনি উঠিপড়ি করিয়া উঠিয়া পড়িলেন ।  
দেখিলেন,—সাবেক আর কিছুই নাই, সকলই নূতন হইয়া  
গিয়াছে,—ছঃখদারিদ্র্যের ভঙ্গস্বরূপ ভেদ করিয়া দেবদুর্ভেদ ঐশ্বর্যের  
শীতল আলোকের রশ্মি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে ! তিনি  
আর একটি পদও অগ্রসর হইলেন না, জাববিভোর হইয়া সেট-  
খানেই দাঁড়াইয়া রহিলেন । শরীরে ঘনঘন রোম-হর্ষ হইতে  
লাগিল, নয়ন-প্রান্তে অশ্রুবারি উছলিয়া পড়িল ; ভক্তিগঙ্গাদ  
স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—স্থির হও, সুন্দরি ! স্থির হও ; সেই  
বৃদ্ধ অতিথি কি আর মানুষ যে, তাঁহাকে বাহিরে খুঁজিতে যাইব ?  
দয়া করিয়া ধরা দিলে ভিতরে থাকিয়াই তাঁহাকে পাওয়া যায়, আর  
ধরা না দেন তো ভিতর-বাহির চুঁড়িয়া বেড়াইলেও কিছুই হই-

বার যো নাই । সেই প্রাচীন পুরুষকে কোথায় খুঁজিয়া বেড়াইতে যাইব বল ? তিনি আছেনও সব ঠাই, আবার নাইও কোথাও । দেখা দেন তো এইখানেই দিবেন, না দেন তো কোথাও দিবেন না । এখনও তাঁকে চিনিতেন না সুন্দরি ? যাহার পাদস্পর্শে কার্ভের তরী স্নানময় হইয়াছিল, যাহার শ্রীচরণসংস্পর্শে পাম্বাণী নানবী হইয়াছিল, যাহার অঙ্গ-সঙ্গে কুঞ্জা রূপসী হইয়াছিল, এ কার্য্য তিনি ছাড়া অন্য কেহ করিতে পারে কি ? তোমার আমাব চেহারা দেখিয়াও কি তাহা বুঝিতে পারিতেছ না ? যিনি এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা, সেই আদি পুরুষই এই প্রাচীন পুরুষ জানিও । এই আমূল পরিবর্তন ব্যাপার সেই চক্রধারীর চক্রেই অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে, অন্তের পক্ষে ইহা আকাশকুসুমের মত কল্পনারই সামগ্রী । সতি ! সতি ! এস আমরা তাঁহার শরণাগত হই, কাতর-কণ্ঠে তাঁহার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি । হায় হায়, আমরা তাঁহাকে সামান্য মানুষই মনে করিয়াছিলাম ! হায় হায়, না জানি তাঁহার সেবার আমাদের কতই না ক্রটি-বিচ্যুতি ঘটিয়াছে । হায় হায়, আমরা পেয়ে রক্ত হারাইয়া ফেলিলাম !

“ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি সুরাসুর ।

কমলা বার পরিচার ।

ভো প্রভু করুণাসাগর ।

ভৃত্য হোইলে অপরাধী ।

ভুঙ্কে যে ব্রহ্মাওঠাকুর ।

ধনু অশ্রদ্ধ নোর যেতে ।

স্তুতি করন্তি যা পরর ॥

মো ছার কেতেক মাতর ।

মো অপরাধ ক্ষমা কর ॥

তু নাথ করুণাবারিধি ॥

জীবক হৃদরে বিহর ॥

প্রভু ন বেন কদাচিত্তে ॥”

ছায় ছায়, ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি দেববৃন্দ এবং অম্বরগণ ঝাঁহার পাদ-  
পদ্মের স্তব করিয়া থাকেন, কমলা ঝাঁহার সেবাকার্য্যে নিযুক্তা,  
ছার আমি আবার তাঁহার নিকট একটা পদার্থই বা কি ? প্রভু হে  
পরুণাসিদ্ধ ! আমার অপরাধ ক্ষমা কর । ভৃত্য না হয় অপরাধীই  
তইরাছে, কিন্তু তুমি তো ঠাকুর করুণার অপার পারাবার ।  
তোমার করুণার তোড়ে সে অপরাধ তো তিষ্ঠিতেই পারে না ।  
নাথ ! তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধিপতি, সকল জীবের  
হৃদয়ে-হৃদয়ে তুমি বিহার করিয়া থাক, তোমার অজ্ঞাত আর  
কি আছে ; তাই প্রার্থনা—আমাদের এই অজ্ঞানকৃত অপরাধ  
কখনও গ্রহণ করিও না প্রভু !

দামোদর দাস ও তাঁহার পত্নী বহুক্ষণ ধরিয়া প্রভুর এই-  
রূপ স্তবস্ততি করিলেন, কত কাঁদিলেন, ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি  
দিলেন, তারপর প্রকৃতিস্থ হইয়া মহামহোৎসবের আয়োজন করি-  
লেন । ভগবানের সেবা, অভিন্ন ভগবান্ ভগবদ্বক্তের সেবা, গো-  
ব্রাহ্মণ-সেবা প্রভৃতি পুণ্যানুষ্ঠান করিতে-করিতে তাঁহারা গোণা  
দিন কুরাইয়া দিলেন । দেহাবসামে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া  
দ্বিবাদেহে বৈকুণ্ঠনাথের সেবা করিতে লাগিলেন ।

## কৃষ্ণপ্রিয়ার পত্র ।

শ্রীবৃন্দাবনের পশ্চিমে জয়নগর রাজ্য । রাজা জয়সিংহ সেই রাজ্যের অধিপতি । তিনি নানা গুণে গুণী ; ধনে কুবেরের মত, দাতৃত্বে কর্ণের মত, বীরত্বে অর্জুনের মত, ধৈর্য্যে ধরণীর মত, বিদ্যার সরস্বতীর মত এবং বুদ্ধিতে বৃহস্পতির মত ছিলেন । তাঁহার দ্বারে লক্ষাধিক অশ্ব নিরস্তুর বাধা থাকিত, পদাতী সৈন্তের তো সংখ্যাই নিক্রপিত হইত না । তিনি দীন-হুঃখীর মাতা-পিতা । মোলারেম মিষ্ট কথা তাঁহার হাঁসিমুখে লাগিয়াই আছে । হরিশ্চন্দ্রেরও অনুরাগ যথেষ্ট ছিল । যেমন তিনি, মহেশ্বরিণীও তেমনি । তিনিও রূপেগুণে ধন্য ছিলেন । নাম চন্দ্রাবতী । তাঁহার মত স্বামিসেবার অনুরাগ লক্ষের ভিতর একজনেরও হয় কি না সন্দেহ । রাজ্য-রাণীর একটি পুত্র ও একটি কন্যা । পুত্রটি যেন সাক্ষাৎ কন্দর্প । কন্যাও কম নয় ; বর্ণ যেন কাঁচা সোণা, মুখখানি সদাই হাস্যপ্রফুল্ল, যেন পূর্ণিমার পূর্ণ চন্দ্র । অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন ভেঙ্গে-চুরে গড়া—সে শোভার আর তুলনা নাই । তাঁহার সেই কৃষ্ণবর্ণ কুঞ্চিত কেশ-কলাপ, খঞ্জন-গঞ্জন নয়ন, বিক্রম-সুন্দর সুরঙ্গ অধর, মুকুতার মত দন্ত, উচ্চ বিস্তৃত বক্ষঃস্থল, কোমল বাহুলভিকা প্রভৃতি দেখিলে মুনির মনও টলিয়া যায় । এই বিশ্ববিজয়িনী সুযমার-অকুরঙ্গ-খনি রমণীমণির নাম শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রিয়া । মাতা-পিতা পুত্রের অপেক্ষাও ইহাকে অধিক ভালবাসেন । বাসিবারই কথা, কেন না যে সকল

সদগুণ থাকিলে মানুষ মানুষকে ভালবাসিয়া থাকে, তাঁহাতে তাহা পূর্ণ মাত্রাতেই ছিল।

কৃষ্ণপ্রিয়া কৃষ্ণ ছাড়া কিছুই জানেন না। কৃষ্ণকথা শুনিতে-বলিতে তিনি বড় ভালবাসেন। ভগবানের পবিত্র চরিত্র অক্ষুণ্ণ পঠন ও শ্রবণ করেন। নাধু-বৈষ্ণবের সেবার জন্ত মঠে-মন্দিরে গোপনেগোপনে ধন প্রেরণ করিয়া থাকেন। স্থানে-স্থানে সমাত্রত স্থাপন, শুদ্ধভাবে ও দৃঢ়চিত্তে বিবিধ ব্রত অনুষ্ঠান তো তাঁহার নিত্য-কর্ম। তীর্থভ্রমণকারী নাধু-মহাত্ম্য মুখে তীর্থকথা শুনিতেও তাঁহার একান্ত আসক্তি। একদিন কোন তৈর্থিকের মুখে কথায়-কথায় শ্রীজগন্নাথের কথা শুনিয়া তাঁহার মন-প্রাণ গলিয়া গেল। সেই অবধি তিনি যখন-তখন জগবন্ধুর কথা মনেমনে ভাবনা করিতেন। ভাবিতে-ভাবিতে নীলাচলনাথের অপার করুণার কথা, মহাপ্রসাদের অপারিসীম মহিমার কথা ও প্রভুর রথযাত্রা প্রভৃতি নীলার কথা হৃদয়ে জাগিয়া উঠিত, আর অমনি আনন্দে তাঁহার হৃদয় গলিয়া যাইত। প্রেমাপ্রবর্ষণ করিতে-করিতে গদগদবচনে বলিতেন, হায়, কবে আমি সেই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গমন করিব, কবে আমি সেই দারুভ্রঙ্কের দর্শনলাভ করিব, কবে আমার সর্বপাপ বিমোচন হইবে, কবে আমার ভব-বন্ধন ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইবে ? হায়, আমি যে ছার রমণীজাতি, আমার কি আর সে সৌভাগ্য ঘটিবে ? নাথ ! এ চক্ষুচক্ষে তোনার সাক্ষাৎ দর্শন ভাগ্যে ঘটুক আর না-ই ঘটুক, একদিন কৃপা করিয়া স্বপ্নেও কি দেখা দিতে পার না ? স্বপ্নে দেখা পাইলেও অভাগিনী আমি মহাতাগ্য বলিয়া মনে করিব। কৃষ্ণপ্রিয়া

প্রেমভরে এই কথা বলেন, আর তাঁহার নয়ন দিরা দরদর  
প্রেমের ধারা বহিয়া যায়,—বদন বক্ষ ভাসাইয়া ধরাতল সিক্ত  
করিতে থাকে ।

শ্রীজগন্নাথেরই ইচ্ছা বলিতে হইবে, ঐ সময় তাঁহার একজন  
সেবক জয়নগরে আসিলেন । জগন্নাথের সেবকগণ তাঁহার পার্শ্বদ  
মধ্যেই পরিগণিত, তার উপর তিলিচ্ছ মহাপাত্রের ঘর বড়ই  
সম্মানিত । ইনি সেই তিলিচ্ছ মহাপাত্রের পূর্বপুরুষ, নাম—বন্ধু মহা-  
পাত্র । ধনু ধনলালসা, বন্ধু মহাপাত্র সামান্য ধনের লোভে জগবন্ধুর  
সেবা ছাড়িয়া নানাবিধ পথক্লেশ সহ করিয়া সুদূর পশ্চিমপ্রদেশে  
আসিয়াছেন । তিনি ধনবান্দিগের গৃহেগৃহে গমন করিয়া শ্রীজগ-  
ন্নাথের মহাপ্রসাদ-নির্ম্মাণ্য দান করেন, তাঁহারাও আপনাকে  
কৃতার্থ বোধ করিয়া প্রচুর ধনরত্ন দিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন ।  
এইরূপে বন্ধু মহাপাত্র অনেক ধন উপার্জন করিলেন । তিনি জয়-  
নগরে থাকিতে-থাকিতে রাজনন্দিনী কৃষ্ণপ্রিয়ার কীর্তিকাছিনী  
শুনিতে পাইলেন । মনেমনে ভাবিলেন,—কৃষ্ণপ্রিয়ার যখন জগন্নাথে  
অত ভক্তি, তখন জগন্নাথের নামে তাঁহাকে একখানি পত্র লিপি,  
অনেক ধন পাওয়া যাইবে । তিনি তখনই কৃষ্ণপ্রিয়াকে একখানি  
পত্র লিখিলেন ।

“শ্রীজগন্নাথক নিমন্তে ।      যে শ্রদ্ধা হেব তুস্ত চিন্তে ॥

দেলে সে আন্তে বেনি ষিবুঁ ।      প্রভু ছামুরে নেই দেবুঁ ॥”

রাজবালা ! আমি শ্রীজগন্নাথের সেবক—পারিষদ লোক, তোমার  
যদি শ্রদ্ধা হয়, শ্রীজগন্নাথের নিমিত্ত যদি কিছু দিবার ইচ্ছা হয়, তবে

আমার কাছেই দিতে পার ; আমি তাহা লইয়া গিয়া প্রভুর সম্মুখে ধরিয়া দিব ।

বন্ধু মহাপাত্র পত্রখানি মুড়িয়া লোকদ্বারা কৃষ্ণপ্রিয়ার নিকট প্রেরণ করিলেন । লোক যাইয়া রাজনন্দিনীকে পত্রখানি প্রদান করিল । জগন্নাথের পারিষদের পত্র শুনিয়া কৃষ্ণপ্রিয়ার আনন্দ তা'র ধরে না । তিনি পত্রখানি একবার বুকে ধরেন, একবার মাথায় ধরেন, মোড়কের মুখে ঘনঘন চুম্বন করেন ; যেন সাক্ষাৎ জগন্নাথকেই পাইয়াছেন । মোড়ক খুলিয়া তিনি পত্রখানি পাঠ করিলেন । এক-বার নয়, দুইবার নয়, শতশত বার পড়িলেন । তাঁহার নেত্র দিয়া অক্ষর প্রবাহ বাহির হইয়া পড়িল । হস্ত থরথর কাঁপিয়া উঠিল । পুলক-কদম্বে সকল অঙ্গ পূরিয়া গেল । বিন্দু বিন্দু স্বেদবারিও দেখা দিল । কণ্ঠস্বর গদগদ হইয়া আসিল । বিশ্ব-বিনিন্দিত অধরোষ্ঠ থাকিয়া-থাকিয়া কাঁপিতে লাগিল । আবোল-তাবোল কত কি বলিতে-বলিতে তাঁহার বাহুজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গেল । তিনি ভাব-সাগরে নিমগ্ন হইলেন । নিমীলিতনয়নে দেখিলেন,—শঙ্খ-চক্রধারী শ্রীহরি তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া বসিয়া আছেন । আবার নয়ন মিলিয়া দেখেন, তিনিই তাঁহার নয়নে-নয়নে । এইরূপে কিছুক্ষণ কাটিল । বাহুজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি মহা চিন্তায় পড়িয়া গেলেন ; তাইতো করা যায় কি, আমি সেই জগন্নাথকে কি দ্রব্য দান করি ? হায়, মহালক্ষ্মী ঐহার ঘরণী, অষ্টনিধি ঐহার পরিচারক, বিধাতা ঐহার আজ্ঞাবহ, রত্নাকর ঐহার নিজ নিবাস, তাঁহার আবার অভাব কিসের ? এই বিশ্বসংসার ভরণ করেন বলিয়াই যিনি বিশ্বস্তর,

তাঁহাকে দিবারই বা কি আছে ? হাশ্বেরই কথা,—জগন্নাথকে কিছু দিতে হইবে ।

অহো ! ষাঁহার দর্শনে পাপীর পাপতাপ দূরে যায়, মহাপ্রলয়েও ষাঁহার পৃষ্ঠদেশে টলে না, সেই নীলাচল-পীঠ ষাঁহার নিবাসস্থল, তাঁহাকে আমি আবার বসিবার কি পীঠ ( পিঁড়া ) প্রদান করিব ? পতিতপাবনী সুরধুনী ষাঁহার পাদসলিল, তাঁহার উপযুক্ত পাণ্ড এ জগতে কোথায় মিলিবে ? অম্লান-পারিজাত-মাঙ্গ্য ষাঁহার গলদেশে সতত বর্তমান, তাঁহাকে আমি কোন্ নম্বর ফুল উপহার দিতে যাইব ? অমূল্য অগুরু চন্দন ষাঁহার ভোগরন্ধনের ইন্ধন, তাঁহাকে দিবার চন্দন কি আছে ? উজ্জল কৌস্তভমণি ষাঁহার বক্ষে বিরাজিত, তাঁহাকে উপহার দিবার উপযুক্ত মণি কোথায় পাইব ? পক্ষিৰাজ গরুড় ষাঁহার বাহন, অশ্ব-গজাদি বাহনে তাঁহার কি হইবে ? ষাঁহার ফণায় ফণায় অমল মণি ঝলমল করিতেছে, সেই সহস্র-ফণা নাগরাজ ষাঁহার শয্যা, আমাদের তুচ্ছ শয্যা কি তাঁহাকে সাজে ? কোটি-সূর্য্যসম-তেজোদীপ্ত সুদর্শন ষাঁহার অস্ত্র, তাঁহাকে অস্ত্রশস্ত্রই বা কি দান করিতে যাইব ? হে প্রভু ! এই চতুর্দিশ ভুবনের কোন সামগ্রীই তো তোমাকে দিবার উপযুক্ত দেখিতে পাইতেছি না । হৃদ্বিহারি, তুমি হৃদয়ে-হৃদয়েই বলিয়া দাও,—কোন্ সামগ্রী তোমায় দিতে হইবে, কি বস্তু পাইলে তুমি স্ত্রীত হও ।

কৃষ্ণপ্রিয়া এইরূপ বলিতে-বলিতে যেন কিছুকণ ধ্যান-স্তিমিত-নেত্র হইয়া রহিলেন । তারপর অকস্মাৎ হাসিতে-হাসিতে বলিয়া



উঠিলেন,—হাঁ হাঁ, এইবার তোমার কিসের অভাব, তাহার হৃদিস্  
পাইয়াছি পাইয়াছি ।—

“আবর কুলকণ্ঠাগণ ।	নাগরী চতুরী সিহান ॥
তুমুর মন নেলৈ হারি ।	রখিলৈ অতি গোপ্য করি ॥
বেতে মাগিল মহাবাহু ।	লেউটি ন দেলে সে আউ ॥
ক্ষীর-নীরর প্রায় হেলা ।	মনরে মন মিশি গলা ॥
খোজি ন পাই বর্ণ চিহ্ন ।	কেবল হেলা মহাশূণ্ড ॥
আউ সকল দ্রব্য অচ্ছি ।	তোতে অপূৰ্ব নাহিঁ কিচ্ছি ॥
মন মাত্রক লব লেশে ।	নাহি তুমুর হৃদদেশে ॥”

শ্রীবৃন্দাবনের চতুরী সিয়ানী নাগরী গোপকণ্ঠাগণ তোমার মন  
হরণ করিয়া লুকাইয়া রাখিয়া দিয়াছে, তুমি কাকুতি-মিনতি  
করিয়া কতই না প্রার্থনা করিলে, কিন্তু কই তাহারা তো আর  
তোমার মন তোমাকে ফিরাইয়া দিল না। দুধে জলে মিশা-  
মিশির মত তাদের মনে আর তোমার মনে এমন মিশামিশি  
হইয়া গিয়াছে যে, আর তার বর্ণচিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া ভার। সে  
যেন শূণ্ডে শূণ্ড মিশিয়া মহাশূণ্ড হইয়া গিয়াছে। তাই মনে  
হয়, তোমার আর ষত দ্রব্য থাকিতে হয় থাকুক, অল্প অভাবও  
কিছু না থাকুক, কিন্তু তোমার অন্তরে মনের ছিটে-কোঁটাও  
নাই, সেই মনের ঋকৃতিই তোমার একমাত্র অভাব।

যেশ কথা, উত্তম কথা, যাহার অভাব তাহাই তোমাকে  
দিতেছি। ধর, এই আমি আমার মন তোমাকে দান করিলাম।  
এখন হইতে আর আমি আমার নই, তোমার কেনা-দাসী হইয়া  
রহিলাম। এতদিন আমার মন আমাকে যাহা বলাইত, তাহাই

বলিতাম, যাহা করাইত, তাহাই করিতাম, অতঃপর আর তাহা করিব না ; তুমি আমায় যাহা বলাইবে, তাহাই বলিব, যাহা করাইবে, তাহাই করিব। কোন আদেশের প্রতিবাদ করিব না ।

সুন্দরী মনেমনে এই সকল কথা বলিয়া শ্রীজগন্নাথের নামে মনের দানপত্র লিখিতে বসিলেন । বসিলেন বটে, কিন্তু এ নয়নে কিছুই দেখিতে পাইলেন না । অশ্রুতে নয়ন দুইটী ভরিয়া গেল, যেন কেমন ভিতরটানেও মুদিয়া আসিতে লাগিল । পেমরাজোর বৃষ্টি সকলই অক্ষুট—সকলই আঝো আঝো । প্রেমের উদর হইলে ভাষাও ফোটে ফোটে ফোটে না, ভাবও ছোটে-ছোটে ছোটে না, কথাও জোটে-জোটে জোটে না । প্রেম বৃষ্টি সকল সাহসেই এলোমেলো করিয়া দেয় । প্রেমিকও বৃষ্টি তাই এলোথেলো হইয়া পড়েন । কৃষ্ণপ্রিয়াও প্রেমের প্রানলো এলোথেলো হইয়া কম্পিত-করে ছড়িতছড়িত অক্ষরে দানপত্রখানি লিখিয়া ফেলিলেন ।

ওহে ও জগতখামি !

এ বিশ্ব-সংসার,                      সকলি তোমার,  
তোমারে কি দিব আমি ॥

( সুধু ) মনটি তোমার নাই ।

যত গোপনারী,                      রেখে দেছে হরি,  
তাহা তো তোমার চাই ॥

এই ধর নাও মন ।

দিয়া হ'লু দাসী,                      নীলাচলশশি,  
দানপত্র এ লিখন ॥

কৃষ্ণপ্রিয়া মম নাম ।

জয়সিংহ পিতা,

চন্দ্রাবতী মাতা,

জয়নগরেতে ধাম ॥

পত্রখানি লেখা হইয়া গেল । আহা, নয়নজলে সেখানি ভিজিয়া জ্বজবে হইয়া গিয়াছে । তিনি একখানি খানের মধ্যে প্রেমাশ্রুসিক্ত পত্রখানি রাখিলেন । অণু জলের আবশ্যক হইল না, প্রেমাশ্রু-জলেই তাহা আঁটিয়া ফেলিলেন । তাহার উপর মোহর করিয়া দিয়া আপন মনের প্রতি বলিতে লাগিলেন,—

“বোইলে—শুন আরে মন । তু ত দুর্জয় মহাশূণ্য ॥  
নিশ্চল নোহু কদাচিত্তে । তেণু মাগুচ্ছি মুহি এতে ॥  
গোবিন্দচরণে রহিবু । নিশ্চল হোই একা থিবু ॥  
এহি সুদয়া মোরে হেউ । লেউটি ন আসিবু আউ ॥”

আরে মন ! তুই তো মহাশূণ্য স্বরূপ, তোকে জয় করা তো সহজ নয় ; কিছুতে তুই নিশ্চলও হইন্ না ; তাই তোর কাছে প্রার্থনা করি,—তুই এখন নিশ্চল নিঃসঙ্গ হোয়ে শ্রীগোবিন্দের পাদ-পদ্মে থাকিবি, দেখিস্ যেন সেখান থেকে আর ফিরিয়া আসিস্ না ; আমার প্রতি তোকে এইটুকু দয়া করিতেই হইবে ।

কৃষ্ণপ্রিয়া সখী আনন্দাকে ডাকিয়া তাঁহার হস্তে সেই পত্রখানি এবং দশটী সুবর্ণমুদ্রা দিয়া বলিলেন,—সখি ! যাও, শীঘ্র যাও, সেই শ্রীজগন্নাথের সেবকের হস্তে এই পত্রখানি দিয়া এস । তাঁহাকে আমার অসংখ্য প্রণাম জানাইয়া প্রণামিস্বরূপ সুবর্ণমুদ্রা দশটী দিও, আর বিনয়-বচনে বলিও, তিনি যেন দয়া করিয়া সেই নীলাদিনাথকে

এই দানপত্রখানি দান করেন, আমার তাঁহাকে যাহা কিছু দিবার, তাহা এই পত্রমধ্যেই রহিল ।

আনন্দা ত্বরিতগতিতে বন্ধু মহাপাত্রের নিকটে গমন করিলেন এবং বিনয়বাক্যে প্রণামী ও পত্র দিয়া কৃষ্ণপ্রিয়ার কাকুতি-মিনতি জানাইলেন । মাত্র দশটা স্বর্ণমুদ্রা দেখিয়া মহাপাত্র তো চটিয়াই লাল । আনন্দের কথার কোন উত্তর না দিয়া কেবল মাথা নাড়িয়া অভিমতি জানাইয়া সত্বর সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন । মনে মনে বলিলেন,—ওঃ, জয়সিংহের কণ্ঠা তো ভারি দানশীলা দেখিতেছি, জগন্নাথের নাম করিয়া প্রার্থনা জানাইলাম, তাহার বিনিময়ে পাইলাম কিনা দশটা মুদ্রা ! বিক্ তাহা দানশীলতায়, বিক্ তাহা বৃথা প্রশংসায় । দেখি, পত্রখানা খুলিয়াই দেখি, এর ভিতরে আবার জগন্নাথকে যা দিবার কি অপূর্ণ সামগ্রী দিয়াছেন । মহাপাত্র পত্রখানির একবার এদিক্-ওদিক্ দেখিলেন, হাতে করিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া ভারি কিনা পরীক্ষা করিয়া লইলেন ; তারপর মুখভঙ্গী করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—হাল্কা ফন্ফনে একরত্তি পত্র, তাহা ভিতরে আবার কি থাকিবে বল ; ও সব ভূয়া কথা, পত্রের ভিতর কিছুই নাই—কিছুই নাই । এই বলিয়া তিনি ফড়ফড় করিয়া খানখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং হিজিবিজি লেখা দেখিয়া দূর করিয়া পত্রখানি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন ।

হায় ধনলুক পণ্ডা, তুমি ও পত্রের কদর কি বুঝিবে ? তোমার তো প্রেমনেত্র নাই, তুমি কি ও লেখা পড়িতে পার ? পড়িতে পারিলেও কি তোমার লোভকলুষিত হৃদয়ে উহার ভাব ধারণ করিতে

পারিবে? কখনই না,—কখনই না? কৃষ্ণপ্রিয়া যাহাকে প্রাণেপ্রাণে বসাইয়া এই পত্র লিখিয়াছেন, হয় তিনি, না হয় তাঁহার অনুগৃহীত জন ছাড়া অন্য কেহই এ পত্রের ভাব বুঝিবেন না,—বুঝিবেন না ।

বন্ধু মহাপাত্র সেদেশে আর থাকিলেন না । কাহা কিছু ধনরত্ন পাইয়াছিলেন, তাহা লইয়াই স্বদেশ অভিযুখে যাত্রা করিলেন এবং কয়েকমাস পরে শ্রীক্ষেত্রধামে আসিয়া পহুঁছিলেন । প্রথমেই দেউলে গিয়া শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিলেন এবং দুঃখ-সুখের কথা জানাইয়া আপন ভবনে চলিয়া গেলেন ।

এদিকে হইয়াছে কি? বন্ধু মহাপাত্র যাই কৃষ্ণপ্রিয়ার পত্রখানি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছেন, সর্বাস্তুর্যামী সৰ্ব্বেগত জগন্নাথও অমনি শ্রীহস্ত বিস্তার করিয়া সেখানি ধরিয়া লইয়াছেন । আহা, ভক্তের ভাবে ভোলা ভগবানের তাহাতে আনন্দই বা কত ।

“বেসনে অতি দীন জন । পাইলে অমূল্য রতন ॥  
যেতে আনন্দ মন তার । তহুঁ অধিক দামোদর ॥  
জন্মক অক হোই থাই । সে যেহে দিব্য চক্ষু পাই ॥  
কিঅবা শতে জন্ম যাএ । য়েবা অপুত্র হোই থাএ ॥  
পাইলে উত্তম নন্দন । যেমন্ত হোএ তার মন ॥  
তহুঁ আনন্দ গলা বলি । তেমন হেলে বনমালী ॥”

অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তি যদি অমূল্য রতন পায়, তাহার মনে তখন যে আনন্দ, দামোদরের এ আনন্দ তাহার অপেক্ষাও অধিক । জন্মাক ব্যক্তি দিব্য দৃষ্টি লাভ করিলে কিংবা শতজন্মের অপুত্র উত্তম পুত্র প্রাপ্ত হইলে যে প্রকার আনন্দে মাতিয়া উঠে, বনমালীর এ আনন্দ তাহার চেয়েও অনেক বেশী ।

অহো, ভক্তগণ না-জানি কি-এক সামগ্রী মাথাইয়া ভগবান্কে মকল সামগ্রী সমর্পণ করেন, যাহা আত্মানন্দে পরিপূর্ণ আনন্দময়ের হৃদয়েও আনন্দের তরঙ্গের উপর তরঙ্গ তুলিয়া দেয়। ভক্তের নিজস্ব সেই অলীম-শক্তি সামগ্রীর জয় হউক !

করুণাময় করিলেন কি, কৃষ্ণপ্রিয়ার সেই পত্রখানি লইয়া পটু-সূত্র দিয়া বাঁধিলেন এবং প্রেমে গরগর হইয়া কণ্ঠে ধারণ করিলেন। কৌন্তভমণির সহিত কৃষ্ণপ্রিয়ার পত্রখানিও তাঁহার হৃদয়মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল।

সেইদিনই রজনীযোগে জগন্নাথ বন্ধু মহাপাত্রের ঘরে গমন করিয়া স্বপ্নযোগে বলিলেন,—ওহে ও মহাপাত্র ! তুমি যে সামান্ত্র ধনের আশায় আমার সেবা ছাড়িয়া জয়নগরে গমন করিয়াছিলে, তাহার জন্ত আমি তোমাকে কিছুই বলিতে চাই না। তুমি নিজে যাহা উপার্জন করিয়াছ, তাহার অংশ লইতেও আমি আসি নাই। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে চাই, আমার ধনে তুমি আমাকে বঞ্চিত করিলে কি নিমিত্ত ? কৃষ্ণপ্রিয়া তোমার হস্তে আমার যাহা প্রেরণ করিয়াছিল, তাহা আমার অমূল্য রতন, তুমি কিনা তুচ্ছ পদার্থের মত তাহা দূর করিয়া ফেলিয়া দিলে ? কৃষ্ণপ্রিয়ার পত্রখানিকে তুমি সামান্ত্র মনে করিও না ; তাহা আমার আকল্প সঞ্চিত ধন। আর তুমি কিনা সামান্ত্র কাগজ মনে করিয়া তাহা ফেলিয়া দিলে ? তুমি ফেলিয়া দিলেও আমার সম্পত্তি আমি ছাড়ি কি প্রকারে ? এই দেখ বিপ্র ! আমি তাহা তখনই লইয়া আসিয়াছি। এই দেখ,— আমার হৃদয়ের দিকে চাহিয়া দেখ, পরম আদরে তাহা হৃদয়েই

